কল্পলতা

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্, ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ

১৩৩৭

একটাকা চার আনা মাত্র

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

বন্ধুবরেষু

সূচি

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু লিখিত

উপন্যাস

রমলা (তৃতীয় সংস্করণ

ছোট গল্প

মায়াপুরী

সোণার হরিণ

রক্তকমল

ছেলেমেয়েদের বই

অজয় কুমার

সোণার কাঠি

কল্পলতা

মায়ের দিন

রাতের অন্ধকার যখন তরল হয়ে আসে, শুকতারা দপ্‌দপ্‌ করে তেল-ফুরিয়ে-যাওয়া প্রদীপের শিখার মত, ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস বয়, আর মিউনিসিপ্যালিটির ময়লাফেলা গাড়ীগুলোর চাকার ঝনঝনানি শব্দে ঘুমন্ত নগরের জনহীন পথ আকুল হ'য়ে ওঠে, তখন কমলার ঘুম ভেঙে যায়। সেই সময়ে তার স্নেহঘেরা কোলে ছোটখুকীর চোখ থেকেও ঘুম চ'লে যায়; গাছের পাতা-ঢাকা নীড়গুলিতে পাখীদের গান গেয়ে ওঠার সময় স্নিগ্ধ ভোর-বেলায় ছড়ানো বিছানাতে মা ও মেয়ের খেলায় মায়ের দিনের আরম্ভ হয়। তরল অন্ধকারে মায়ের বড় মুখখানির দিকে চেয়ে সদ্য-জাগা পাখীর ছানার মত 'অ্যাঁ' 'অ্যাঁ' শব্দ ক'রে খুকী আপন মনে হাত-পা ছোঁড়ে, কমলা তার নবীনকোমল অধরে চুম্বন দিয়ে এলানো শাড়ীটা কোনমতে জড়িয়ে বিছানা থেকে ওঠে, ছেলে-মেয়েদের গায়ে বিছানার চাদরটা টেনে দেয়। সন্ধ্যেবেলায় যে চাদরটা বিছানাতে পাতা হয়েছিল, ভোরবেলায় সে চাদর যে কি ক'রে কুণ্ডলী পাকিয়ে মেঝেতে গিয়ে পড়ে, ছেলেমেয়েদের নিদ্রা-পদ্ধতির সে এক রহস্য। কমলা স্বামীর খাটের পায়ের দিকের

জানলাটা বন্ধ ক'রে দেয়, ভোরের আলো ও ঠাণ্ডা বাতাস যেন স্বামীর ঘুমের ব্যাঘাত না করে। তার পর, সে আবার বিছানাতে শুয়ে ছোটখুকী চাঁপুকে বুকে টেনে নেয়, তার তুল্‌তুলে পায়ে হাত বুলিয়ে চাঁপার কলির মত আঙুলগুলি নিয়ে খেলা করে। সারা দিনের কাজে খুকীকে যে একটু আদর করবে তারও সময় হয় না, এই ভোরবেলা হচ্ছে কমলার মাতৃ-স্নেহলীলার সময়। খুকী মায়ের মুখের দিকে চেয়ে হাসে আর দুধ খায়,—মাঝে মাঝে সুর ক'রে ব'লে ওঠে–– অ্যাঁ, অ্যাঁ, অ্যাঁ।

—দুষ্টু, চাঁপু, চুপ্, এক্ষুনি বাবার ঘুম ভেঙে যাবে। চাঁপু তার ফুলের কুঁড়ির মত চোখ দু'টি নাচায়।

খাটের ওপর স্বামী শোন ; তলায় মেঝেতে লম্বা বিছানা,—এক দিকে খুকী আর খুকীর মা, তার পর লাখী, তার পর রাণু, তার পর মণা, তার পর শোভা,—বয়সের বাড়তি অনুসারে শোয়, মাঝে একটি ক'রে পাশ-বালিশ ব্যবধান। এই পাশ-বালিশ হচ্ছে প্রত্যেকের বিছানা-রাজ্যের সীমানা। লাখীর দু'দিকে দুই পাশ-বালিশ ও পায়ের দিকেও একটা বালিশ চাই,—তার বয়স চার কি না, সেজন্যে চারটে বালিশ না হলে তার চোখে ঘুম আসে না। রাণু কিন্তু ভারি লক্ষ্মী। সে বলে, আমার একটা পাশবালিশও চাই না ; কি হবে মা, বাজে বালিশ নিয়ে, আমি ত আর লাখীর মত ছোট নেই যে গড়িয়ে মেঝেতে প'ড়ে যাব। ছ'বছর তার বয়স, এরই মধ্যে গিন্নি। সবচেয়ে দুষ্টু হচ্ছে মণা। রাতে ঘুমের ঘোরে সে ঘুরপাক খায়, শোভা বেচারাকে লাথি মেরে তার ওপর দিব্যি

পা তুলে মহানন্দে ঘুমোয়। শোভা যে সবার বড়দিদি এই গর্ব্বটুকু বজায় রাখবার জন্যে সে আর নালিশ করে না, ছোট ভাই ঘুমের ঘোরে হাত পা ছোঁড়ে, তা কি করা যায়। সে মাঝে মাঝে বলে বটে, মা, ও চর্‌কির পাশে আমি শোব না; কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় আর আলাদা বিছানা করতে দেয় না, সে মণার পাশেই শোয়।

দু'টো মোটা পাশবালিশের দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলে শোভা ভাবে, আজ নিরাপদে ঘুমানো যাবে; কিন্তু রাতে যখন চরকি ঘোরে,—কোথায় থাকে পাশ-বালিশ, কোথায় বা থাকে মাথার বালিশ,—মণার এক পা চ'লে যায় শোভার বিছানাতে, আর এক পা চ'লে যায় মেঝেতে, চাদরটা তালগোল পাকিয়ে থাকে, কিন্তু কারুর ঘুমের কোনও কম্‌তি বা ব্যাঘাত হয় না।

খুকীর দুধ খাওয়া শেষ হলে খুকীর চোখ ধীরে ধীরে বুজে আসে, আবার সে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু খুকীর মায়ের আর ঘুমানো চলে না। কমলা ধীরে উঠে আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে, চুলগুলো মাথায় কুণ্ডলী ক'রে বেঁধে, ঘুমন্ত ছেলেমেয়েগুলির দিকে সস্নেহ নয়নে চেয়ে দেখে। ইচ্ছে করে প্রত্যেককে বুকে জড়িয়ে চুমো খায়, কিন্তু তা আর হয়ে ওঠে না। লাখীকে সোজা ক'রে শুইয়ে দিয়ে তার চার-পাশে চারটি বালিশ ঠিক ক'রে রাখে। রাণু কি শান্ত ভাবে ঘুমোচ্ছে, তার কোলের পুতুলটিরও নড়চড় হয়নি। মণাটাকে মেঝে থেকে তুলে বিছানাতে শুইয়ে দেয়, মণা বিড়বিড় ক'রে ব'কে ওঠে 'গোল' 'গোল', আর সঙ্গে সঙ্গে পা ছোঁড়ে—সারা বিকেল ফুটবল খেলে তার আশ মেটেনি।

চারিদিক্ নিঝুম, সবাই ঘুমোয়, ভোরের আলো পূবের পাঁচিল

দিয়ে আসে, ময়নাটা খাঁচায় উস্‌খুস্ করে। কমলা ময়নাটাকে বলে, গোলমাল করিস্ না। তার পর ঝি-চাকরদের জাগাতে নীচে চ'লে যায়। মধুটা কোনও দিন যদি সকালে ওঠে, দালান বারান্দা সিঁড়ি সব ধুতে হবে, ধুয়ে শুকিয়ে যাবার আগে যদি সবাই উঠে পড়ে, পায়ে পায়ে কাদা হয়ে যায়। এই ধোওয়া নিয়ে স্বামীর সঙ্গে কত গোলমাল না হয়েছে। স্বামী বলেন, আচ্ছা, কলকাতা সহরের সব বাড়ীর দালান বারান্দা সিঁড়ি উঠান সব জল দিয়ে যদি ধুতে হয়, কত জল লাগে বল ত! অত জল মিউনিসিপ্যালিটি দেবে কি ক'রে? কমলা বলে, তা হিঁদুর বাড়ী আমি ম্লেচ্ছপনা করতে দেব না।

মধুর ঘরের শিকলি ঝন্‌ঝন্ শব্দে বেজে ওঠে,—হতভাগা ওঠ্‌না, কলে জল এসেছে কতক্ষণ।

—উঠি মা!

কমলা নিজেই বাল্‌তি ও ঝাঁটা নিয়ে সিঁড়ি ধুতে আরম্ভ করে; জানে, ঝাঁটার শব্দ না শুনলে মধু উঠ্‌বে না। আর মা ধুচ্ছেন জানলে সে আর শুয়ে থাকতে পারবে না। চোখ রগড়াতে রগড়াতে মধু ছুটে আসে,—মা আমায় দিন, আমায় দিন্।

কমলা দরজা খুলে রান্নাঘরে ঢোকে,—সব ঠিক আছে,—রাতে তাহলে বেরাল ঢোকেনি। উনানের ছাই নিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে বাহির হয়ে আসে—ওসব ক্রীম, পাউডারে দাঁত মাজা তার পোষায় না।

মুখ ধুয়ে কমলা ওপরে উঠে আসে, সব দরজার গোড়ায় জল-ছড়া দেয়, শাশুড়ী ঠাকরুণের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে

জিজ্ঞেস করে,—মা, রাতে কেমন ঘুম হল? উত্তর আসে, ভাল না মা। কয়েক দিন হল শাশুড়ীর হাঁপানিটা বেড়েছে। কমলা শোবার ঘরের দরজায় দাঁড়ায়, খুকীর সুখস্বপ্নহাস্যভরা মুখখানি দেখে, তার পর মণাকে ডাকে, খোকা খোকা! মণা রোজ মাকে বলে, মা, ভোরে উঠিয়ে দিও, পড়া মুখস্থ করব; কিন্তু কোনওদিন সে ভোরে উঠতে পারল না। কমলা দু'তিনবার ডাকে, হাত ধ'রে ঝাঁকুনি দেয়। মণা গাঁইগুঁই ক'রে বসে, আবার শুয়ে পড়ে। ঘুম-ভরা ছেলেকে টেনে তুলতে কমলার মনে বাজে,—বলে, ঘুমোক, কত পড়বে!

স্বামীর, ছেলেমেয়েদের দাঁত-মাজার সরঞ্জাম ঠিক ক'রে রেখে, ওপরের ঠাকুর-ঘর মুছে, উনানে আগুন দিয়ে, স্নান ক'রে কমলা যখন রান্নাঘরে ঢোকে, তখন সূর্য্য উঠে গেছে, অরুণ-রথচূড়া পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে দেখা যায়। তাড়াতাড়ি চায়ের জল বসিয়ে দিয়ে গয়লার কাছ থেকে দুধ মেপে নেয়। মধুর সিঁড়ি বারান্দা ধোওয়া হয়ে গেছে, সে এসে দাঁড়ায়,—মা, চা, বাবু যে হাঁকছেন।

—হাঁকতে দে, জল বসিয়েছি। চায়ের বাটি না হলে বিছানা থেকে উঠতে পারেন না, কিন্তু ছেলেমেয়েগুলির যে মাথা খাচ্ছেন। হ্যাঁ রে, ছেলেমেয়েগুলোর সব মুখ ধোওয়া হয়েছে?

—মুখ ধোওয়া কোথায় মা, সব এখন যুদ্ধু হচ্ছে।

—যুদ্ধু কি রে?

—বালিশ ছোঁড়াছুঁড়ি।

—আবার আজ হচ্ছে, রোস দেখাচ্ছি!

বিছানা ধামসানো বা বালিশ ছোঁড়া কমলা মোটেই পছন্দ করে না, তার বুকে যেন বাজে, হনহন ক'রে সে ওপরে চ'লে যায়।

শোবার ঘরে দু'পক্ষে যুদ্ধ চলে,—এক দিকে মণা আর লাখী, অপর দিকে শোভা আর রাণু, তাদের বাবাও মাঝে মাঝে যোগ দেন। মণা সব চেয়ে ওস্তাদ, তার তাকটা ঠিক হয়। লাখী বেচারার ছোট বালিশগুলিই সবাই টেনে টেনে ছোড়ে। সে মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে ওঠে,—আমার বালিশ, আমার বালিশ। তার পর নিজের পক্ষের জয় হচ্ছে দে'খে হেসে ওঠে। এই যুদ্ধক্ষেত্রে চাঁপু কিন্তু সুখে নিদ্রা যায়।

মাকে দে'খে যুদ্ধটা হঠাৎ থেমে যায়, মণা কিন্তু হাতের বালিশটা শোভাকে ছুঁড়ে মারতে ছাড়ে না।

—হতভাগা ছেলেরা, সকালে উঠে কাণ্ড দেখ না, মেরে—

সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠে—মা, মণাই ত আরম্ভ করলে—

—আমি! বাঃ, বাবা ত প্রথমে—

মা দেখো না, আমার বালিশ, এই তুলো বেরিয়ে গেল।

—মণা শীগ্‌গীর ওঠ্, হতচ্ছাড়া ছেলে—আর হ্যাঁ গা, তুমি—তুমি কি শিং ভেঙে বাছুরের দলে—

স্ত্রীকে দে'খেই স্বামী শুয়ে পড়েন, নীরবে চোখ বোজেন। মণা দৃপ্ত ভাবে উঠে চ'লে যায়, জানে, মা এখন স্নান ক'রে কাচা কাপড় প'রে, সুতরাং তার ওপর কোনও চড় বা চাপড় পড়ার আশঙ্কা নেই।

স্বামীর চা ও ছেলেমেয়েদের সিদ্ধ ওটমিল-মিশ্রিত দুধভক্ষ্য

বাটিগুলি সাজিয়ে মধুর হাতে দিয়ে কমলা ভাঁড়ারঘরে তরকারি কুটতে বসে, ঠাকুর এখুনি এসে পড়বে। মধু এসে দাঁড়ায়—বাজার কি আনতে হবে মা? ঝি ঝামা দিয়ে কড়া মাজতে-মাজতে কলতলা মুখর ক'রে তোলে। লাখী এসে দাঁড়ায়, সঙ্গে শোভা।

—দেখ মা, লাখী দুধ খাচ্ছে না।

—মা, আমায় বাবা একটু চা দিচ্ছে না কেন?

কমলার সামনে বঁটি,—চারি দিকে তরকারির পাহাড়, আলু কোটা, পটল কাটা চলছে। তার সঙ্গে হুকুম করা, ছেলেমেয়েদের অভিযোগের মীমাংসা করা, বামুনঠাকুরের ফরমাস শোনা, সব চলেছে।

—লক্ষ্মী লাখু, দুধ খাও গে, আমার সঙ্গে চা খেও। ওই রে চাঁপু জেগেছে, রাণু, নিয়ে আয় ত মা, দুধটা খাইয়ে দে'না।

শোভা হচ্ছে পড়ুয়ে মেয়ে, সে সংসারের কাজে ঘেঁসে না। রাণুর প্রথম ভাগ শেষ হয়েছে, 'ঐক্য বাক্য' আর তার পোষাচ্ছে না, মূর্খতার অখ্যাতি সে বহন করতে রাজী আছে, বিদুষী বলে সে বিখ্যাত হতে চায় না। সেজন্যে সংসারের একটু কাজ করতে পারলে সে খুসি, ততক্ষণ ত মাষ্টার মহাশয়ের কাছে পড়াটা ফাঁকি দেওয়া যায়। সে সর্ব্বদাই মাকে সাহায্য করতে ব্যস্ত, চাঁপু কাঁদলেই সে পড়ার ঘর থেকেও ছোটে।

ঠাকুরকে চাল ডাল বের ক'রে তরকারি বুঝিয়ে, কমলাকে একবার ওপরে যেতে হয়। বাড়ীখানা এতক্ষণে সরগরম হয়ে উঠেছে। পড়ার ঘরে মণার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাণু চেঁচাচ্ছে,—কলতলায় ক্ষেত্তরের মা বাসন মাজার সঙ্গে বক্‌বক করছে,—

রান্নাঘরে তেলের কল্‌কল শব্দ হচ্ছে,—আর শোবার ঘরে কেষ্টো খাটের বিছানা তুলছে,—তলার বিছানাতে লাখীতে চাঁপুতে স্বামীতে মিলে হাসাহাসি চেঁচামেচি চলছে,—বারান্দাতে ময়নাটাও তার সঙ্গে ডেকে উঠছে। কমলা শোবার ঘরের দিকে এখন যায় না, চাঁপু 'মা' ব'লে চেঁচালে, তাকে কোলে না নেওয়া দু'পক্ষের পক্ষেই কষ্টকর ব্যাপার হবে, শেষে ক্রন্দনের জয়ই হবে। সে সিঁড়ির পাশে ঠাকুর ঘরে চ'লে যায়, সকাল থেকে ঠাকুর-দেবতার একটু নাম করবার সময় পায়নি। সাদা শাড়ীটা ছেড়ে একটা তসরের কাপড় পরে; কিন্তু আহ্নিক করতে বসে নীচের কলরব কাণে আসে, মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। নীচে মধুর গলা শোনা যায়। কি মাছ পেল, কত পয়সা ফিরল. এ সব জানতে মন উসখুস্ করে, আহ্নিক তাড়াতাড়ি সেরে চ'লে আসতে হয়।

মাছ কত ভাগ ক'রে কুটতে হবে ব'লে রান্নাঘরটা পরিদর্শন ক'রে ভাঁড়ার-ঘরের ঢুকে কমলা দেখে, শাশুড়ি-ঠাকরুণ নীচে নেমে এসে ভাঁড়ার-ঘরের এক কোণ দখল ক'রে বসেছেন, তাঁর স্নান-আহ্নিকও হয়ে গেছে। শাশুড়ী বলেন, দাও বৌমা, পাণগুলো আমিই সাজছি; না, বাপু, তোমার এ মেয়ের জ্বালায় পারা গেল না। চাঁপু ঠাকুরমার কোলে চ'ড়ে নেমে এসেছে, এখন কোল থেকে নামতে চায় না, আলুর খোসা দিয়ে তাকে ভুলোতে হয়।

সকালের ঘড়ির কাঁটাগুলো ছুটে চলে, ঠাকুরের ঝোল সাঁত্‌লানো হতে না হতেই কলের ঘরে ছেলেমেয়েদের ভিড় লেগে যায়।

লাখী দিগম্বর হয়ে এসে বলে, মা, আমায় কেউ চান করিয়ে দিচ্ছে না।

মণা বলে, আমার খদ্দরের সার্ট কোথায় মা?

শোভা বলে, আমি কোন্ শাড়ী পরব?

রাণু মুখ লাল ক'রে বলে, মা, আজ এক মেম আমাদের স্কুল দেখতে আসবেন, আমি সেই সোণালী ফ্রকটা পরব?

শোভা মনে মনে ব'লে ওঠে, সিল্কের শাড়ী প'রে গেলে আবার হেড মিস্ট্রেস্ চটেন, নিজেরা ত বিকেলে কত সাজ-গোজ ক'রে বেরুন হয়।

হ্যাঁ রে, স্কুলে যাবি, আবার সাজগোজ ক'রে যাওয়া কি রে।

রাণুর ইচ্ছা, আজ ফ্রক না প'রে শাড়ী প'রে যায়, কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারে না।

দিদিদের দয়া হলে তারা লাখীকে স্নান করিয়ে দেয়। কিন্তু স্নানের সময় লাখী এত জল ছোড়ে, দুষ্টুমি করে, একবার গা মুছিয়ে দিয়ে আবার গা মোছাতে হয়, দেরী হয়ে যায়, সেজন্যে সহজে তারা কেউ লাখীকে স্নান করাতে রাজী হয় না। কমলাকে স্নান করাতে হয়। এই নবনীকোমল দেহে তেল রগড়ানো, সাবান মাখানো, ধোয়ানো, জল মোছানোতে আনন্দ আছে, কিন্তু রোজ সে সুখ উপভোগ করবার সময় কোথায়, মধুকে ডাকতে হয়, দে বাবা লাখীকে চান করিয়ে। কমলা চাঁপুকে স্নান করায়।

তার পর দালানে আসন-পিঁড়ে সশব্দে পড়ে যায়। 'ঠাকুর ভাত দাও।' 'শীগ্‌গীর!' ছেলেমেয়েরা গো গ্রাসে গিলতে থাকে।

—হ্যাঁ রে মণা, এই ত সাড়ে ন'টা, আস্তে খা—

—মা, আমার আজ পরীক্ষা। ওজর একটা আছেই। কিন্তু পরীক্ষা আছে ব'লে আধ ঘণ্টা আগে স্কুলে যাবার কারণ সম্বন্ধে কেহ প্রশ্ন করে না। মণার মনে শুধু জাগে, কাল দুটো লাট্টু হেরেছি, আজ সেগুলির উদ্ধার করতে হবে।

ছেলেমেয়েরা খেতে বসে, একটু দেখবারও সময় নেই, কমলা তোলা-উনানে তাড়াতাড়ি পটল ও লুচি ভেজে এ্যালুমিনিয়মের বইএর মতন টিফিনের বাক্স সাজায়। বামুন-ঠাকুরের আলুর দম এখনও হয়ে ওঠেনি! ভাঁড়ার-ঘরের দরজার চৌকাটে ব'সে শাশুড়ী কিছু তদারক করেন।

'গাড়ী আয়া বাবা।' শোভা আর রাণু ঝড়ের মত ছোটে, পিঠের ওপর বেণী দোলে, জুতোর হিলগুলো সিঁড়িতে খট্‌খট্ করে, বুঝি হিল-ওয়ালা জুতোশুদ্ধ ঠিকরে পড়ে। 'ওরে, খাবারের বাক্স?' সেদিকে তাদের হুঁস থাকে না, খাতা-বইগুলো বুঝি হাত থেকে প'ড়ে যায়। মধু টিফিনের বাক্স নিয়ে পেছনে ছোটে, কমলাও উঠে এসে ভাঁড়ার-ঘরের জালতি দেওয়া জানলা দিয়ে দেখে,—মেয়ে-দুটো উঠল, দরজা বন্ধ হল, বাস্ চল্ল।

—মা স্কুলে যাচ্ছি। বইভরা চামড়ার ব্যাগটা দুলিয়ে মণা সামনে এসে দাঁড়ায়।—আজ পরীক্ষা বুঝি?—হাঁ মা, বলে সে তাড়াতাড়ি একটা প্রণাম সেরে নেয়।

পরীক্ষার দিন মাকে প্রণাম ক'রে গেলে ফলটা ভাল হবেই, এ বিশ্বাস তার দৃঢ়। কমলা তার সার্টের কলারটা ঠিক ক'রে দেয়, গলার বোতামটা আঁটতে চায়।

—থাক মা, ওটা খুলে রাখা ফ্যাসান, আর যা গরম। নিমেষের মধ্যে মণা অন্তর্হিত হয়ে যায়। এদিকে স্বামী খেতে বসেন ; তাঁর পাশে লাখী ও চাঁপু।

চাকরদের জলখাবার দিয়ে, এক হাতে এক বড় পেতলের বাটিতে চা ও আর এক হাতে পাখা নিয়ে কমলা স্বামীর কাছে এসে বসে। চা নয়, চায়ের সরবৎ, তাতে চায়ের চেয়ে দুধ ও চিনির ভাগই বেশী, এতেই বেলা একটা পর্য্যন্ত চলবে।

মায়ের সঙ্গে চা খাবে, না, বাবার সঙ্গে গরম মাছ-ভাজা খাবে, এ সমস্যা লাখী সমাধান করে উঠতে পারে না। 'চা চাই না' বলে' সে গরম মাছ-ভাজাই খেতে আরম্ভ করে। তারপর মায়ের গলা জড়িয়ে চায়ের বাটির দিকে এমন ভাবে চায় যে চা একটু দিতেই হয়। চাঁপু কিন্তু একটু আলু খেয়েই সন্তুষ্ট, লক্ষ্মী মেয়ে!

পাণ নিয়ে যখন কমলা উপরে আসে, স্বামীর অর্দ্ধেক সাজগোজ হয়ে গেছে, মধু পাখার বাতাস করছে। সে মাকে দেখেই পাখাটা রেখে অকারণ চ'লে যায়। কমলা পাখা করতে করতে দু'একটা সংসারের কথা বলে। সকালের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর এই মিলন, আফিসের পোষাক পরার অবসরে পাখার বাতাসে সাংসারিক প্রেমালাপ হয়। কমলা কোটটি ধরে, স্বামী দু'টো হাত তাতে ভ'রে বলেন,—থ্যাঙ্ক ইউ ডিয়ার। তার পর এক হাতে টুপি নিয়ে অপর হাতে কমলার ঠাণ্ডা নরম গালে আদর করেন। কমলার গাল-দুটিতে রক্ত ফেটে পড়ে, বলে, যাও, ঢং করতে হবে না।

স্বামী বলেন, সংসার-সংগ্রামে রণক্ষেত্রে যোদ্ধার বেশ পরিয়ে

পাঠাচ্ছ, বিজয়-তিলক দাও। কমলা একটু ঘাড় বেঁকিয়ে দরজার কাছে যেন পথ রোধ ক'রে দাঁড়ায়। এই ভঙ্গীতে তাকে বড় সুন্দর দেখায়। কোনও দিন বা উচ্ছ্বাসের আবেগে স্বামী চুমো খেয়ে ফেলেন। কমলার সমস্ত দেহে পুলকের শিহরণ লাগে।

—তবে আসি প্রিয়ে।

স্বামীর জুতোর শব্দ মিলিয়ে যায়, সদর দরজা বন্ধ হবার শব্দ কানে আসে, ঘরের মাঝে কমলা উদাসভাবে যেন স্বপ্নের ঘোরে দাঁড়িয়ে থাকে,—সব কাজ ভুলে যায়। বাড়ীখানা স্তব্ধ, নিঝুম, মনটা ভারী হয়ে আসে। আঁচল দিয়ে খাটের পায়াগুলো ঝাড়ে, অকারণে কুলুঙ্গি থেকে তেলের, ওষুদের শিশিগুলো নামিয়ে মুছতে আরম্ভ করে, কিন্তু কাজে মন থাকে না। সকালের সেই কর্ম্মময়ী কমলা যেন বদলে গেছে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যে।

দালানের কোণ থেকে একটা ডাক আসে—মা, মা, দেখ না—

কমলা চমকে ওঠে, মনের কুয়াসা কেটে যায়, বলে—যাই, বাবা, ঠাকুরকে জিজ্ঞেসা কর ত—মাগুর মাছের ঝোল হয়েছে কি ?

—হয়েছে মা।

সাবান দিয়ে ধোবার জন্যে রুমাল, গেঞ্জি, মোজা, খুকীর জামা সব জড় ক'রে মধুকে দিয়ে কমলা লাখীকে মাগুর মাছের ঝোল ভাত খাওয়াতে বসে। লাখী একটু পেটরোগা, বাবা মা দাদা দিদিদের সঙ্গে বার বার খাওয়াই তার কারণ। মুখ তার সারা দিন টুক্‌টাক্‌ চলছে। স্বামী তার জন্যে বকেন, আবার

নিজেই দিতে ছাড়েন না, খাবার সময় সামনে এসে বসলে কিছু মুখে না দিয়ে থাকা যায় না।

লাখীকে খাওয়াতে বসলেই চাঁপু কোথা থেকে টলতে টলতে চলতে চলতে এসে থালার কাছে থপ্ ক'রে ব'সে পড়ে, বলে—ম্যা ম্যা, ভত্ ভত্, তএর ওপর এমন একটা জোর দেয় যে না হেসে থাকা যায় না।

সকালে কাজ হচ্ছিল দ্রুতগতিতে, যেন মেলগাড়ীর ইঞ্জিন ছুটে চলেছে। এখন কাজ চলে ঢিমেতেতালে। ভাঁড়ারঘরের খুঁটিনাটি, বসার ঘরের টেবিল সাজানো, শোবার ঘরের ঝাড়পোঁছ চলে অলস ভাবে। এই ধূলোঝাড়া, গোছানো, সাজানো, মোছা যেন পরম উপভোগের সুখকর কাজ।

গির্জ্জের ঘড়িতে বারোটা বাজে, দুপুরের রোদ ঝাঁ ঝাঁ করে, গলির জনস্রোত, গাড়ী চলা মন্দ হয়ে আসে। খাঁচার ময়নাটা ছাতু ছোলা খেয়ে ঝিমোয়, শাশুড়ী ঠাক্রুণ মাঝে মাঝে হাঁক দেন, বৌমা, আর কত বেলা করবে?

—এই যে মা, ছাদের কাপড়গুলো তুলে যাচ্ছি।

ছাদের সিঁড়ির মাঝে জানলার কোণে কিন্তু দাঁড়াতে হয়, পাশের বাড়ীর একটি মেয়ের অসুখ, খবরটা নেওয়া দরকার। জানলায় দাঁড়াতেই পাশের বাড়ীর বৌ ডাকে,—দিদি, এখনও খাওয়া হয়নি?

—দেখ না ভাই, কাজের কি আর শেষ আছে।

—আর তোমার আবার যে-রকম ঝরঝরে কাজ ভাই।

তার পর জানলায় দাঁড়িয়ে সংসারের সুখ-দুঃখের কথা আরম্ভ হয়। পাশের বাড়ীর বৌ বলে, মেয়েটার জ্বর আর ছাড়ছে না, বাঙ্গালীর ঘরে অসুখ কি লেগেই থাকবে? বউয়ের মেজাজ আজ ভাল ছিল না, সংসারের টানাটানি। তার পর কমলার কাছ থেকে দশ টাকা ধার চেয়ে বসে। কমলা জানায়, পাঁচ টাকা সে কোনও মতে দিতে পারে, সন্ধ্যে-বেলায় যেন বৌ আসে। কিছু টাকা পাওয়া যাবে শুনে বৌএর মলিন মুখ একটু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, মেয়েটার ঔষধ-পথ্য টাকার অভাবে হচ্ছে না। তার পর পাড়ার গল্প ওঠে, কার ছেলে পিকেটিং ক'রে জেলে গেছে, কার মেয়ে রোজ পিকেটিং করতে যায়, এত সাহসও আজকাল মেয়েদের! এবার পূজোয় খদ্দর ছাড়া কিছু কিনবে না ঠিক করেছে, কিন্তু খদ্দরের যা দাম। তার পর কমলার নতুন চুড়ির প্যাটার্ণটা দেখতে চায়।

একটা ছেলের কান্নার শব্দ আসে, দুপুরের জানলায় নিভৃত আলাপ ভেঙে যায়।

শাশুড়ী ঠাকরুণকে খাওয়াতে বসিয়ে নিজে খেতে বসতে দেড়টার আগে হয় না, বাহিরে দালানে ঝি চাকররাও একসঙ্গে খেতে বসে।

খাওয়ার পরও কি কাজের বিরাম আছে? একগাদা সেলাই প'ড়ে, ছেলেমেয়েগুলো কাপড় ছিঁড়তে ওস্তাদ। তার পর এ সব খদ্দরের কাপড় সেলাই করাও হাঙ্গামা। মণা কিন্তু খদ্দর ছাড়া কিছু পরবে না, আর সেই বেশী ছেঁড়ে। তবু হাফপ্যাণ্ট ক'রে ছেঁড়া কিছু কমেছে।

নিঝুম অপরাহ্ণ, চাঁপু মেজেতে একটা কাঁথার ওপর ছোট বালিশ মাথায় দিয়ে ঘুমোয়। লাখী পাশে ব'সে অসম্ভব সব কথা বলে, মা, আচ্ছা তুমি বড় না বাবা বড় ? আচ্ছা, তোমার ত বাবার মত গোঁফ নেই, মেয়েদের থাকে না বুঝি ? লাখীকে বুকে টেনে চুমো খেয়ে কমলা বলে, চুপ কর লাখী, একটু ঘুমো না বাছা। লাখী তার জন্তু-জানোয়ারের রঙীন ছবিভরা এ, বি, সি, ডির বইখানি নিয়ে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে নিজের মনে মনে কথা কয়। কখন তার চোখ ঘুমে ঢুলে পড়ে, কমলা তাকে কোলে টেনে সরু সুরে গান গেয়ে ঘুম পাড়ায়। ছাদে দু'-একটা পায়রা বক্‌বকম্ করে।

চারিদিক্ নীরব। জনহীন পথে একটা ফিরিওয়ালার ডাক করুণ সুরের মত ঘুরে ঘুরে ফেরে। একটা চিল ছাদ দিয়ে উড়ে যায়। নীচে চাকরেরা ও ওপরে ছেলেমেয়েরা ঘুমায়। বাড়ীখানা স্তব্ধ, যেন রৌদ্রময়ী রাত্রি, একটা মাছি ভন্‌ভন্ ক'রে ঘোরে।

লাখীকে শুইয়ে দিয়ে কমলার আর সেলাই করতে ভাল লাগে না। আলমারীটা যেন টানে, যাদুমন্ত্রে ভোলায়। আলমারী খুলে সে সাজানো কাপড়গুলি আবার সাজাতে আরম্ভ করে। কিন্তু আলমারী সাজানো আসল ব্যাপার নয়, আলমারীর ওপরের তাকের পেছনে নীল সিল্কের রুমাল মোড়া দুটি ছোট্ট জামা বাহির করে, সে দু'টির দিকে চেয়ে মেজেতে বসে পড়ে, তার মন কোন্ অজানা দেশে উড়ে যায়—এই সময়টা তার দিন-রাতের সুখ দুঃখের কর্ম্মের বাহিরে। জামা দু'টি তার প্রথমা কন্যার, এক বছর হতে না হতে নিউমোনিয়াতে সে মারা গেছল ; সে কতদিন, পনেরো ষোল বছর হবে। সেই প্রথম-জাতাকে হারানোর সুপ্তশোক

অপরাহ্নের নিস্তব্ধ প্রহরে মনের অতল থেকে জেগে ওঠে,—এখন সে শোকের দুঃখজ্বালা নেই, বেদনা গভীর নয়, রহস্যময়, মন কোন্ স্বপ্নলোকে চলে যায়। কমলা ভাবে, সে যদি আজ বেঁচে থাকত পাড়ার নীলিমার মত হয়ত সুন্দরী হত, হয়ত তার এতদিনে বিয়ে হয়ে যেত, ফুটফুটে খোকার মা হত, হয়ত সে—। কিন্তু তাকে বড় ক'রে ভাবতে যেন সে পারে না, সেই এক-বচ্ছরের ননীর পুতুলটিই চোখে ভেসে ওঠে, চোখ ছলছল করে।

জামা দুটি ভাল ক'রে পাট ক'রে তুলে রেখে আলমারী বন্ধ ক'রে মেজেতে আঁচল পেতে সে বসে। এই অলস মধুর অপরাহ্ণ-টুকু তার স্বপ্ন দেখার, স্বপ্নবোনার, মন নিয়ে খেলা করার সময়—কত কথা কত সাধ মনে হয়—ঘুমন্ত লাখীর দিকে চাঁপুর দিকে চেয়ে সাদা মার্ব্বেলের ওপর কালো চুল এলিয়ে সবুজ পাড় ছড়িয়ে শোয়, কখন ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ে। বারান্দার ঘড়িটা টিক্‌টিক করে, সময় কেটে যায়, বাড়ী নীরব,—যেন রূপকথার ঘুমন্ত রাজকন্যার স্বপ্নপুরী।

ঝনঝন শব্দে কড়ার শব্দ হয়, সদর দরজা নড়ে ওঠে। মধু ছুটে গিয়ে দরজা খোলে। দুড়দাড় ক'রে ছুটে, দালান পেরিয়ে, সিঁড়িতে খট্‌মট শব্দ করতে করতে মণা স্কুল থেকে আসে,—সমস্ত বাড়ী জেগে ওঠে। কমলার ঘুম ভেঙে যায়, চাঁপু চীৎকার ক'রে কেঁদে ওঠে, ঘুম থেকে জেগে একটু কাঁদা তার স্বভাব। বইয়ের ব্যাগটা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে মণা তাকে ভোলাতে বসে। চাঁপু চুপ করলে মণা লাখীর চুল ধ'রে টানে। কমলা ব'কে উঠলে, মণা,

পকেট থেকে দুটো পেয়ারা বের ক'রে বলে, তোমার জন্যে এনেছি মা। কমলার আর বকুনি দেওয়া হয় না। শুধু বলে, জুতো খোল্, সার্ট ছেড়ে হাত-মুখ ধুতে যা' ভূত কোথাকার।

—মা বড্ড ক্ষিদে।

—হাত মুখ ভাল করে সাবান দিয়ে ধুগে, পথের যত ময়লা গায়।

একটু পরেই মেয়েরাও স্কুল থেকে এসে পড়ে। কাপড় জামা না ছেড়েই রাণু চাঁপুকে আদর করতে বসে, স্কুল থেকে একটি ফুল এনেছে, সেটি তার হাতে দেয়।

কমলার সংসারের কাজ আবার আরম্ভ হয়। ছেলে-মেয়েদের কাপড়-ছাড়া, হাত-মুখ-ধোওয়া তদারক করতে হয়। তার পর সবাইকে জলখাবার দিয়ে চাঁপু ও লাখীকে দুধ খাওয়াতে বসে।

বেলা গড়িয়ে যায়, রান্নাঘরে আগুন পড়ে, বাড়ী ধোঁয়াতে ভ'রে ওঠে। কমলা ঝিকে বকে, এত দেরীতে আগুন দিস্, এখন যদি বাবু এসে পড়েন? স্বামী আসার আগে চুল বেঁধে গা ধুয়ে নিতে হয়। শাশুড়ী ঠাকরুণ বলেন, এসো বৌমা, চুলটা বেঁধে দি। —নিজেই বেঁধে নিচ্ছি মা। আয়না নিয়ে চুল বাঁধতে বসে। চাঁপু এসে আয়নায় উঁকি মারে, আপন মনে হাসে, মাথার ফিতেটা টানে, চুল বাঁধতে দেরী হয়ে যায়।

—বড় জ্বালাতন করিস্ চাঁপি। চাঁপুর কিন্তু বকুনিকে গ্রাহ্য নেই, নিজের মুখখানা আয়নায় দেখতে সে ব্যস্ত, চিরন্তনী নারী!

কোন দিন শাশুড়ী ছাড়েন না, চুল বাঁধতে বসেন। চুল বাঁধা হলে সীমন্তে সিন্দুররেখা টেনে বলেন, জন্ম-এয়োস্ত্রী থাকো,

২

আশীর্ব্বাদ করি। মুখ রাঙা করে শাশুড়ীর পায়ের ধূলো সীমন্তে মুছে কমলা গা ধুতে যায়, বুক দুরদুর করে।

স্বামী আসার আগেই কমলা ফলের রেকাব, জলখাবারের রেকাব সাজিয়ে, ধোওয়া কাপড় গুছিয়ে, ঘরে ব'সে থাকে, টুকটাক কাজ করে, যেন প্রতীক্ষা করছে না, কাজ করছে।

ঘরে ঢুকেই খাবারের রেকাব দে'খে স্বামী খুসি হন, কমলার সদ্য সাবান-ধোওয়া গালে আদর ক'রে বলেন, সাঙ্গ হয়েছে রণ! তুমি এস এস নারি, আন তব হেমঝারি!'

—যাও! হ্যাঁগা, এ প্যাকটাতে কি?

—তোমার জন্যে নতুন শাড়ী।

—হ্যাঁ! খালি ঠাট্টা। খোকার বিস্কুট এনেছ?

—ওই ভুল হয়ে গেল।

—দশটা টাকা দিতে হবে আজ।

—কাউকে দিতে হবে বুঝি?

—না, আমার হাতে কিছু টাকা নেই।

—দেখ, কি সময় পড়েছে, এ টানাটানির বাজার, কিছু টেনে খরচ করতে হয়।

এই রকম সংসারিক প্রেমালাপ কিছুক্ষণ চলে। বেশীক্ষণ চলতে পারে না। সাজগোজ ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে খাবার খেয়ে স্বামী যান বেড়াতে অর্থাৎ মিত্তিরদের বাড়ীর তাসের আড্ডায় অথবা ইউনিয়ান ক্লাবে।

—ওগো, আজ সকাল সকাল এসো।

—হ্যাঁ, বেশী রাত হবে না।

কিন্তু সাড়ে ন'টা দশটার আগে আর বাড়ী ফেরা হয় না।

তার পর ভাঁড়ার-ঘরে রান্না-ঘরে কাজের অবধি থাকে না। ঠাকুরকে সব রান্নার জিনিষ দিতে, রান্না বুঝিয়ে দিতে সন্ধ্যে হয়ে আসে। সন্ধ্যার শাঁখ বাজিয়ে ছাদে তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে কমলা প্রণাম করে। তারপর তার আর কাজের বেগে নিশ্বাস ফেলার সময় থাকে না—দুধ জ্বাল, রুটি লুচি বেলা, কত কাজ! কাজের মাঝে মন উস্‌খুস্ করে, রাণু, লাখী ও চাঁপুকে নিয়ে মধু পাড়ার পার্কে কখন বেড়াতে গেছে, এখনও ফিরল না কেন, মণাও এখনও হকি খে'লে আসে নি, শোভাটা পাড়ার কোন্ বাড়ীর ছাদে আড্ডা দিচ্ছে। হাতের লেচিগুলো কমলা তাড়াতাড়ি পাকায়।

কলরব করতে করতে ছেলেমেয়ের দল বাড়ীতে ঢোকে, সব মুখ রাঙা, ঘর্ম্মাক্ত। নানা অভিনয়, অভিযোগ, আবদারে রান্নাঘরের সামনে দালানটা মুখর হয়ে ওঠে। কমলার সে সব শোনার অবসর থাকে না, সে রুটি বেলে। শাশুড়ী সিঁড়ির ওপর মালা জপতে জপতে মাঝে মাঝে ব'লে ওঠেন, ওরে গোলমাল করিস না। মধু লাখীকে টানতে টানতে এসে বলে, মা, লাখুর ঘুম পেয়েছে।

—দু'খানা গরম লুচি খাইয়ে দে না বাবা।

চোখ রগড়াতে রগড়াতে লাখী বলে, আমাল পটল ভাজা কৈ?

খেতে ব'সে কিন্তু লাখীর সব ঘুম চ'লে যায়, সে আর রান্না-ঘর ছেড়ে উঠতে চায় না। দাদা-দিদিরা যখন মাষ্টার মশাইএর কাছে পড়াশোনা সেরে দালানে খেতে বসে, তখনও তার মুখ চলছে।

সবার খাওয়া শেষ না হলে সে উঠতে চায় না। খাওয়া শেষে শোভা নিজে মুখ ধুয়ে লাখীর হাতমুখ ধুইয়ে দেয়, বলে, চ, শুতে।

দলবেঁধে হল্লা করে সবাই শুতে যায়; চাঁপুর দুধের বাটি নিয়ে কমলা ওপরে আসে, সবাই কোথায় কি রকম শুল তদারক করে। চারটে বালিশ চার ধারে ঠিক আছে কি না তা দে'খে লাখী নিশ্চিন্ত মনে শোয়। মণা স্কুলের গল্প করে; রাণু ব'লে ওঠে, বেশী বক্‌বক্ করিস নে, ঘুমোতে দে। হঠাৎ লাখী উঠে বসে, বলে, বিছানা বড় ঠাণ্ডা। অয়েল-ক্লথের ওপর কাঁথা দিয়ে সে শোবে না, সে কি চাঁপুর মত ছোট?

মণা অম্নি ব'লে ওঠে, কিন্তু রাত্তিরে বিছানা ভেজাতে—

রাণু বলে,—তুমিও ত বাপু সেদিন—

—যাঃ! সে বুঝি আমি—কথাটা তোলা যে ভুল হয়েছে, তা মণা বুঝতে পেরে চুপ করে।

চাঁপু মায়ের কোলে শুয়ে দুধ খায়, ছেলেমেয়েদের চোখে ঘুম ভ'রে আসে, ঘরের আলো নিভে যায়, দালানের আলোটা মিটমিট ক'রে জ্বলে, আবার বাড়ী নিঝুম নিদ্রিত হয়।

ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়িয়ে কমলা সিঁড়ির পাশে দালানের কোণে একটা সেলাই বা একখানা বাংলা মাসিক পত্রিকা নিয়ে বসে। আজ সন্ধ্যেতে অজিত, কি নির্ম্মল, কি সারদা, কেউ আসেনি, সেই কথা মনে পড়ে। এরা হচ্ছে পাড়ার ছেলে, তাকে দিদি ব'লে ডাকে। সন্ধ্যাবেলায় দালানে প্রায়ই তাদের বৈঠক বসে। কেউ ফাষ্ট ইয়ার, কেউ থার্ড ইয়ারে পড়ে। কাচি বুরুশ,

তরুণ মন। সবাই এসে দিদির কাছে কত সংবাদ দেয়, কত অভিযোগ কত আবদার জানায়, সঙ্গে সঙ্গে চা, খাবার, মাঝে মাঝে মাছের কচুরি বেগুনি লাভ হয়। কি তর্ক করতে পারে ছেলেগুলো!

বাংলা মাসিকের একটা গল্প কমলা পড়তে আরম্ভ করে -- স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা হচ্ছে না, স্ত্রী স্বামীকে ছেড়ে চ'লে যাচ্ছে—এই রকম প্লটের একটা গল্প। কি ক'রে স্বামীকে সংসারকে ছেড়ে মেয়েমানুষ চ'লে যেতে পারে, কমলা তা কল্পনা করতে পারে না। সেই দুঃখিনী হতভাগিনীর জন্যে তার চোখে জল আসে, গল্প পড়তে ভাল লাগে না, পত্রিকা মুড়ে রাখে। সিঁড়িতে মস্‌মস্‌ জুতোর শব্দ হয়, কমলা চমকে ওঠে, তার চোখের তন্দ্রা চ'লে যায়, স্বামী আসছেন।

স্বামীকে খাইয়ে নিজে যখন খেতে বসে রাত এগারোটা বেজে যায়। তার পর ঝি চাকর খেলে রান্নাঘর ধোওয়া হয়। সদর দরজা বন্ধ আছে কি না দেখে, ভাঁড়ার-ঘরে কুলুপ দিয়ে পাণ চিবোতে চিবোতে কমলা যখন ওপরে ওঠে, দেখে, স্বামী দিব্যি খাটে শুয়ে, নাসিকা-গর্জ্জন হচ্ছে।

দালানে সে একটু চুপ ক'রে বসে, আকাশে তারাগুলো ঝিলমিল করে, গাছের পাতা কাঁপিয়ে মৃদু বাতাস বয়। সুখনিদ্রা-শান্ত শিশুগুলির দিকে সস্নেহ নয়নে চেয়ে সে ভগবানের চরণে প্রার্থনা করে, এদের তুমি সুখে শান্তিতে রেখো।

—ওগো শুতে এসো, রাত যে একটা হবে, ব'লে স্বামী পাশ ফেরেন।

ধীরে ঘরে ঢুকে কমলা চাঁপুর পাশে শুয়ে নিমেষের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে।

এম্নি করে মায়ের দিনের পর রাত, রাতের পর দিন কেটে যায়।

কিন্তু সেদিন যে কি অঘটন ঘটল কমলা তা নিজেই প্রথমে বুঝতে পারেনি। মেথরের দল মিউনিসিপ্যালিটির ময়লা-ফেলা গাড়ী হাঁকিয়ে অনেকক্ষণ চ'লে গেছে। মধু নিজেই উঠে সিঁড়ির বারান্দা ধুয়েছে। বাইরে রোদ উঠে গেছে, কমলার তখনও ঘুম ভাঙেনি। যখন সে জাগল, লজ্জিতভাবে দেখল, স্বামী উঠে খাটে ব'সে, ছেলেমেয়েরাও জেগেছে, তবে মায়ের ঘুম ভেঙে যেতে পারে ভেবে গোলমাল করছে না, ফিস্‌ফাস কথা হচ্ছে।

স্বামী বল্লেন, কি গো, এত দেরী আজ, শরীরটা খারাপ?

—কেন, একদিন দেরী হতে পারে না! আমি কি কল না কি, যে রোজ এক সময়ে উঠতেই হবে, না আমি কলের কুলি যে ভোরের ভোঁ বাজলেই কাজে ছুটতে হবে!

—না, তা বলছি না।

কারুর দিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে কমলা নীচে নেমে গেল। মায়ের মেজাজ আজ সুবিধের নয় দে'খে ছেলেমেয়েরা সেদিন হল্লা বা বালিশ ছোঁড়াছুঁড়ি করতে সাহস করলে না।

সারা সকাল কোনও কাজে কমলার মন লাগল না, দেহ শ্রান্ত, মনটা কেমন ভার, গত রাতে ভাল ঘুম হয়নি।

দেরীতে উঠে সব বিশৃঙ্খল হয়ে গেল সেদিন; দশটা প্রায় বাজে

সব রান্না হল না, ছেলেমেয়েরা শুধু ডাল ভাত ও ভাজা খেয়ে স্কুলে গেল ; কমলা আপন মনে ব'লে উঠ্‌ল, আমি কি মাইনে-করা চাকরাণী, আমার যেমন খুসি আমি কাজ করবো। স্বামী স্নান ক'রে এসে দাঁড়িয়ে বল্লেন,—ঠাকুর, যা হয়েছে দাও।

সেদিন কমলা বিশেষ কিছু খেলে না, খেতে অরুচি। মধু ও বামুনঠাকুর খাওয়াতে কত পীড়াপীড়ি করলে, তাদেরও ভাল ক'রে খাওয়া হল না। শাশুড়ী ঠাকরুণ বল্লেন, আজ শরীরটা ভাল, নেই বৌমা, শুয়ে থাকগে। কমলা মনে মনে বল্লে, হ্যাঁ, শুয়ে থাকব, সংসারের কাজ কে করবে ?

অপরাহ্ণে সে নিজের ঘরে এলিয়ে শুয়ে পড়ল, কোনও সেলাই বা বই হাতে নিলে না। লাখী একটা আবদার করতে গিয়ে থাপ্পড় খেয়ে কেঁদে ঘুমিয়ে গেল।

কমলার মন বড় চঞ্চল মনে হল ; তার সেই প্রথম-জাতা কন্যার কথা বার বার মনে পড়তে লাগল। তার ছোট জামা দুটি বাহির ক'রে বুকে জড়িয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে কাঁদলে। কেন যে কাঁদছে, তা সে নিজেও বুঝতে পারলে না ; কাঁদতে কাঁদতে মন হাল্কা হয়ে আসতে লাগল, বিদ্যুতের ঝিলকির মত তার মন চমকে উঠল, সে বুঝতে পারল, তার কি হয়েছে আজ ; মুখ প্রথমে গম্ভীর হল, তার পর রহস্যময় মধুর সুন্দর হয়ে উঠল।

সারা দিনের কাজ সেরে রাতে যখন কমলা শুতে গেল, সে শোবার ঘরে ঢুকল না, সামনের বারান্দায় লালপাড়ওয়ালা আঁচল পেতে শুয়ে পড়ল, তারা-ভরা আকাশের দিকে চেয়ে রইল, একটা তারা খ'সে পড়ল।

স্বামী কখন পাশে এসে বসেছেন জানতেই পারেনি। স্বামী তার মাথায় হাত বুলাতে সে স্বামীর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলে, স্নিগ্ধ স্বরে বল্লে—ওগো।

—কি!

স্বামীর মুখ তার মুখের উপর নত হয়ে পড়তে সে স্বামীর কানে কানে কি কথা কয়ে রহস্যময় হেসে উঠল, তারা-ভরা আকাশ ঝিকমিক করতে লাগলো।

স্বামী হেসে বল্লেন—এই ব্যাপার? আবার আর একটি! যেন কমলাই একমাত্র দায়ী!

অধরে আদর করে বল্লেন, তা বেশ, কাল দিদিকে চিঠি লিখে দেবো।

—না গো না, অত তাড়াতাড়ি নেই, এখনও অত অকর্ম্মণ্য হইনি।

স্বামী তার তাম্বুল-রঞ্জিত আবেগ কম্পিত ওষ্ঠে চুম্বন করিলেন।

কমলার চোখে ঘুম এল না। একবার ছাতে ঘুরে এল, দালানে-ঝোলানো বিদ্যাসাগর, গান্ধী, চিত্তরঞ্জনের বাঁধানো ফটোগুলির সাম্‌নে দাঁড়িয়ে তাঁদের প্রণাম কর্‌লে। অমন কোনও মহাপুরুষ তার গর্ভে জন্মাবে, অত পুণ্যবতী নয় সে, তবু গর্ভবতী মাতার মানস-স্বপ্ন কে বল্‌তে পারে!

তারাগুলির দিকে চেয়ে কত কথা ভাবতে ভাবতে গভীর রাতে কমলা ঘুমিয়ে পড়ল।

বেহালা

বৌদি তার ভ্রমরের মত কালো ভ্রূ বাঁকিয়ে হীরার মত জ্বলজ্বলে চোখ কাঁপিয়ে বললে,—না।

আবার বললুম, বৌদি' আর সাধতে পারি না, একটা গান শোনাবে কি না?

বৌদি তার রাঙা অধর ফুলিয়ে সোনার দুল দুলিয়ে সাপের কুণ্ডলীর মত সুন্দর খোঁপাটা নেড়ে বললে,—না।

বললুম, আচ্ছা, শোন বৌদি একটা গল্প বলছি, এ শুনে দেখি তুমি কেমন গান না গাও!

বৌদি তার পানে-রাঙা ঠোঁট থেকে হাসির আবীর ছড়িয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে মুক্তার মালা একটু বাজিয়ে বল্লে, হাঁ, ভাই, বলত একটা গল্প, এই ত বেশ, তা নয় খালি গান আর গান।

ধীরে বললুম, গেল বছর আমার ভারি মজার অসুখ করেছিল, শুনেছ?

আলতা মাখা পা দু'টি দুলিয়ে ইজি-চেয়ারে দেহ এলিয়ে ছোট একটি 'না' বলে, বৌদি আমার গল্প শুনতে লাগল।

শাড়ীর আঁচলটা ঘাড় থেকে ফে'লে চেয়ারটা কাছে টেনে নিয়ে আমি গল্প বলতে লাগলুম।

এই রকম রাত্তির বেলা। সমস্ত দিন অসহ্য গরম গেছে, রাত্তিরে একটু ঠাণ্ডা হয়েছে। বিছানায় শুয়ে কিছুতেই ঘুম

আসছে না। এই ইজি-চেয়ারটা তখন আমার ঘরে থাকত। একটা নভেল নিয়ে ইজি-চেয়ারটায় শুলুম ; বিচ্ছিরি গল্পটার স্থুরু, প্রথমেই স্ত্রীর মৃত্যুশোকে স্বামী আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে। নভেলটা রেখে দিয়ে ভাবলুম একটু বেহালা বাজাই। বাক্স খুলে বেহালা বের ক'রে দেখি, ছড়টা আবার ঠিক নেই, টেবিলের উপর বেহালা রেখে দিয়ে ইজি-চেয়ারটা বারান্দায় টেনে শুয়ে পড়লুম। সপ্তমী কি নবমী তিথি হবে, স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না, তারাগুলো হীরের টুকরোর মত জ্বলজ্বল করছে, ফুরফুরে মিষ্টি হাওয়া বইছে, চোখে মুখে সমস্ত দেহে জ্যোৎস্না ঝ'রে পড়তে লাগল। কত কি যে হাবিজাবি হিজিবিজি মনে পড়তে লাগল, এই জ্যোৎস্নার কথা কবিরা কত রংএ, রসে, ভাবে, ছন্দে বলেছে, কত যুগের কত প্রেমিকার বিরহের দীর্ঘশ্বাস এতে মেশান, আরও কত কি কথা। জ্যোৎস্নায় যেন ভিজে সমস্ত দেহ-মন ঝিমিয়ে আসতে লাগল, ঠিক ঘুম নয়, চোখ বুজি, কালো পর্দ্দার ওপর কত কালো অদ্ভুত মূর্ত্তি নেচে বেড়াচ্ছে ; চোখ মেলি, অতি সূক্ষ্মতন্তুময় ওড়নার মত জ্যোৎস্নার আলো আমার ওপর বাতাসে কাঁপছে ! দেখ ভাই, মদ কি আফিম কখনও খাইনি, কিন্তু মনে হল যেন একটা নেশা করেছি। কবিরা যে বলে, চাঁদের আলোয় কি একটা মায়া আছে, মোহমন্ত্র প'ড়ে লোককে মাতাল ক'রে তোলে তা খুব সত্যি ; জ্যোৎস্না যেন দেহের প্রতি লোমকূপ দিয়ে রক্তের সঙ্গে মিলে গেল, সমস্ত দেহ ঝিমঝিম করছে, যতরকম অসম্ভব কথা, আজগুবি কল্পনা মাথায় আসতে লাগল, এক আফিম-খোরের গল্প পড়েছিলুম, মনে হল ঠিক তার মত অবস্থা। একটু ভয় হল কিন্তু, নেশাটায় ধীরে ধীরে মসগুল হয়ে যাচ্ছি।

হঠাৎ যেন একটা সাদা পর্দ্দা উড়ে গেল, জ্যোৎস্না আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তারাগুলো যেন নীলপরীদের মত প্রদীপ হাতে ক'রে আমার দিকে নেমে আসছে।

চোখ বুজে রইলুম। একটা গানের সুর কানে এসে বাজল, বহুদূর হতে একটা করুণসুরের রেশ, স্তব্ধ নিশীথে অন্ধকার পথের ধারে একটি বেণুর মর্ম্মরধ্বনির মত,—যেন মঙ্গলগ্রহে ব'সে কে বেহালা বাজাচ্ছে, তারি অতি ক্ষীণ ঝঙ্কারধ্বনি কানে এসে লাগছে।

সুরটা কাছে এল, মনে হ'ল তারালোক থেকে নয়, পৃথিবীর বুক থেকে, এই অন্ধকার ঘুমন্ত বাড়ীর ভিৎ দিয়ে উঠে আসছে, একটি করুণ মধুর বেহালার ঝঙ্কার। আরও কাছে এল। না, মাটি থেকে উঠছে; না, এ সুর যেন কোন অজানা দেশ থেকে সাগর পার হয়ে দক্ষিণ বাতাসে ভেসে আসছে। আরও কাছে, হাঁ, এই বাড়ীতে, আমার ঘরের মধ্যে ব'সে কে বেহালা বাজাচ্ছে!

চোখ চেয়ে উঠে বসলুম, মাথাটা ঝাঁকিয়ে নিলুম, কান দু'টো চুলকালুম। হাঁ আমার ঘর থেকেই ত বেহালার ঝঙ্কার আসছে, অতি মৃদু, অতি মিষ্টি, একটি তার কেঁপে কেঁপে বাজছে।

অন্য সময় হলে হয়ত ভয়ে মূর্চ্ছা যেতুম, কিন্তু এ সুর কোন সোনার স্বপ্নের মত, এত মিষ্টি যে কোনও ভয় হল না, তাছাড়া কোনও নেশার ঘোরে যেন বাহিরের জগৎ ভুলে গেছলুম।

এবার বেহালার সব তারে ঝঙ্কার উঠছে, যেন একটা গিরি-ঝর্ণা নুড়ির মল বাজিয়ে নৃত্য করতে করতে চলেছে। কত রকমের

গান, কত স্থর বেজে উঠছে। কখনও দক্ষিণ বাতাসে বসন্তের পুষ্পবন উতলা হয়ে উঠছে,—কুহু ডাক্‌ছে ; কখনও গ্রীষ্মমধ্যাহ্নে তপ্ত পবনে ঝরা-পাতার দীর্ঘশ্বাস,—ক্লান্ত কপোতের করুণ কণ্ঠ ; কখনও শ্রাবণের অবিরল বারি ঝরার ঝরঝরানি গান,—বেহালা যেন স্থরে ক্ষেপে উঠছে, মেঘ ডাকছে, বজ্র হাঁকছে, জল কলকল বয়ে ; চলেছে শেষে ধীরে ধীরে তারাগুলি কেঁপে কেঁপে স্তব্ধ হয়ে আসছে,—প্রেমিকের মৃদুগুঞ্জনের মত।

এতক্ষণ স্থরের মায়ালোকে ভুলেছিলুম, বেহালা বাজান থামতেই গা সির সির করতে লাগল, স্থরগুলো যেন ঘুরে ঘুরে হিমশীতল আঙ্গুরের ডগা দিয়ে গায়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে, কাঁপতে লাগলুম, সে বেহালা-বাদক ত আমার ঘরেই ব'সে আছে !

চুপ করে চেয়ারে ব'সে রইলুম। ঘরের স্তব্ধ অন্ধকার হাঁ ক'রে আছে। একবার ঢোঁক গিলে বল্লুম—কে ? কোনও উত্তর নেই।

জোর ক'রে বলতে চাইলুম, কে বেহালা বাজাচ্ছিলে, ঘর থেকে বের হয়ে এস। কিন্তু গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, কোনও স্বর ফুটল না। ঘর নিঝুম, একটু শব্দ নেই। ভাবলুম, হয়ত আমার মনেরই ভুল, কিন্তু বেহালা ত স্পষ্ট শুনলুম, এখনও তার স্থর কানে বাজছে। মরিয়া হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পা টিপে টিপে দরজার গোড়ায় এসে তাড়াতাড়ি স্থইচ্‌টা টিপে আলো জ্বালালুম। কেউ ঘরে নেই, বেহালাটা টেবিলের উপর অতি শান্তশিষ্ট নির্দোষী ছেলের মত স্থির হয়ে প'ড়ে আছে। টেবিলের উপর থেকে একটা মোটা বাঁধান শক্ত বই হাতে নিয়ে তক্তার তলা ঘরের কোণ সব দেখলুম। কেউ কোথাও নেই।

মাথা ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগল। কি আশ্চর্য্য! সত্যি কেউ ঘরে ব'সে বেহালা বাজাচ্ছিল, না, আমি কি স্বপ্নে বেহালা শুনলুম? বুকে হাত দিয়ে দেখলুম, বুকটা একটু দ্রুত তালেই ধুক্‌ধুক্ করছে। এক গেলাস ঠাণ্ডা জল খেয়ে, মাথায় চোখে মুখে জল দিয়ে শুয়ে পড়লুম।

রাতে ঘুম ভেঙে যেতে লাগল, ভাল ঘুম হল না, সেই বেহালার সুরগুলো যেন সাপের মত আমায় জড়িয়ে নেচে বেড়াচ্ছে। সকালের আলো ঘরে আসতেই মনটা হাল্কা হয়ে গেল, রাতের কথা একেবারে ভুলে গেলুম।

কিন্তু সন্ধ্যা হতেই ভয় হতে লাগল। যতক্ষণ বেহালা বাজে বেশ শুনতে লাগে, কিন্তু তারপর!

রাতে খেয়ে আর একা ঘরে যেতে সাহস হল না। খোকাকে বল্লুম, খোকা গল্প শুনবি আয়। খোকাকে ঘরে টেনে নিয়ে এলুম। তার সঙ্গে তাস খেলতে খেলতে তাদের ইস্কুলের মাষ্টারের গল্প, ছেলেদের গল্প, খেলার গল্প করতে করতে খানিকক্ষণ কাটল। দশটা বাজলেই সে ব'লে উঠল, দিদি, বড় ঘুম পাচ্ছে। অগত্যা তাকে ছেড়ে দিলুম। বেহালাটা ভাল ক'রে বাক্সে বন্ধ ক'রে ঘরের কোণে রেখে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লুম। বারান্দায় জ্যোৎস্নায় গিয়ে বসতে আর সাহস হল না।

একটু তন্দ্রা এসেছে, ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেল। গুমরে গুমরে কান্নার মত অতি করুণ এক সুর ঠিক আমার তক্তার তলা থেকে আসছে, যে কোণে বেহালার বাক্স রেখেছি, সেই কোণ থেকে ক্ষুব্ধ বেদনার হাহাকারের মত বেহালার একটা তার কোন রুদ্ধ

আবেগে কেঁপে কেঁপে যেন এই ছিঁড়ে যাবে, অন্ধকার ছোট গর্ত্তে বন্দী পাখীর মত বেহালাটা যেন বাক্সের মধ্যে ছটফট করছে; ক্ষুব্ধ রোষে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠছে।

বিছানায় উঠে বসলুম। তারের কাঁপনের সুরের সঙ্গে আপন বুকের স্পন্দন ধ্বনি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। একটা শব্দ হল, বেহালার বাক্সের ডালাটা যেন খুলে মেঝেতে পড়ল, বেহালার তারে তারে আনন্দের ঝঙ্কার উঠল।

ভীত বিস্মিত চোখে কোণের অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইলুম। অদ্ভুত অন্ধকারের রংটা, ঠিক কালো নয়, কালোর ওপর স্নিগ্ধ নীলের পর্দ্দা কাঁপছে, সেখান থেকে কত রাগরাগিণী নটীর মত সুরের নূপুর বাজিয়ে নৃত্য করতে করতে কোথায় চ'লে যাচ্ছে; অন্ধকারটা রিম ঝিম করছে। অন্ধকারটার দিকে চেয়ে যেন কোন মন্ত্রশক্তিতে বিমুগ্ধ হয়ে স্থির হয়ে বেহালা বাজান শুনতে লাগলুম।

কতক্ষণ বেজেছিল বলতে পারি না। মুমূর্ষু হংসের শেষগানের মত করুণ সুরে বেহালার গান থামল। ঘরের অন্ধকার কাঁপতে লাগল। গা সিরসির করতে লাগল। মনে হল, অন্ধকার কোণে ব'সে যে এতক্ষণ বেহালা বাজাচ্ছিল সে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে; অন্ধকারে দেওয়াল হাৎড়ে আমার তক্তার পেছন ঘুরে মাথার কাছে আসছে। গা ছম ছম করতে লাগল। চেঁচিয়ে ব'লে উঠলাম, কে?

আসার উসখুস শব্দ যেন থামল, বেহালার একটি তার অতি মৃদু কেঁপে মিষ্টি সুরে ব'লে উঠল, আমি।

চেনা গলা, অনেক দিন আগে যেন শুনেছি। সাহস ক'রে বললুম, কে তুমি?

বেহালা আবার বেজে উঠল, আমি অসিত।

অসিত? অমিয়ার দাদা?

হাঁ, আমি আর এখন অমিয়ার দাদা নেই, এক মাস হল আমি দিল্লীতে নিউমোনিয়ায় মারা গেছি।

পাশ-বালিশটা আঁকড়ে ধ'রে কাঁপতে লাগলুম, নিরুপায় হয়ে বললুম, আপনি কেন এখানে এসেছেন?

তোমাকে বেহালা শোনাতে। তুমি একবার আমাকে বেহালা বাজাবার জন্যে অনুরোধ করেছিলে, মনে আছে?

হাঁ, অমিয়া সেদিন আমার কাছে দিনটা কাটাতে এসেছিল, আপনি যখন তাকে বাড়ীতে নিয়ে যেতে এলেন, আপনাকে বেহালা বাজাতে বলেছিলুম বটে।

অনেক রাত হয়েছিল ব'লে তখন বাজাতে চাইনি, বলেছিলুম, আর-একদিন এসে বাজাব। তারপরেই দিল্লীতে চাকরী পাওয়ায় কলকাতা ছেড়ে চ'লে যেতে হল।

দিল্লী যাবার আগের দিন দেখা কর্‌তে এসেছিলেন, সেদিনও বাজাতে বলেছিলুম বটে।

হাঁ, আমি, বলেছিলুম, দিল্লী থেকে ছুটির সময় এসে শোনাব। সেই কথাটা রাখতে এসেছি।

এখন আপনি—

আমি এখন প্রেতাত্মা, তোমার কোনও ভয় নেই।

বিছানার চাদরটা সর্ব্বাঙ্গে মুড়ি দিয়ে শুয়ে বললুম, আচ্ছা, এখন আপনি যান।

আর বেহালা বাজাব?

চাদরের ভেতর থেকে কোনও মতে বললুম, না।

তোমাকে বলেছিলুম বেহালা শোনাব, তাই এসেছিলুম, আর এসে শোনাতে হবে ?

অস্ফূটস্বরে বললুম, না। তারপর আপাদমস্তক চাদরে ঢেকে বালিশে মুখ গুঁজে পড়লুম।

আচ্ছা Kreutzer Sonataটা শুনিয়ে যাই।

আবার বেহালার ঝঙ্কার উঠল, স্বরগুলো নটীর নূপুরের মত ঘরে ঘুরে ঘুরে বেজে জুঁই ফুলের মত আমার বিছানার উপর ঝ'রে ঝ'রে পড়তে লাগল, তক্তা, লেপ, চাদর, বালিশ সব সুরে কাঁপতে লাগল। যতক্ষণ বেহালা বাজছিল, যেন কোন সুধার স্রোতে ভেসে যাচ্ছিলুম, কিন্তু যেই থামল, সমস্ত দেহ আবার সিরসির ক'রে কাঁপতে লাগল।

অসিত বললে, চললুম, নমস্কার।

তাকে কোনও উত্তর দিতে পারলুম না, বেহালার সুর ধীরে বাহিরে ভেসে যেতে লাগল,—দূরে আরও দূরে যেতে লাগল, অতি করুণ ক্ষীণ হয়ে দিগন্তে মিলিয়ে গেল, তারালোকে মিশিয়ে গেল।

বেহালা থেমে গেল কিন্তু ঘরের অন্ধকারে বাহিরে পাণ্ডুর জ্যোৎস্নায় বেহালার গানের সুরে ঝিমঝিম করছে, সারা রাত বিছানায় চুপ ক'রে চোখ বুজে প'ড়ে রইলুম, মাথায় সুরগুলো রিমঝিম করতে লাগল।

তার পরের রাত থেকে অবশ্য আর কেউ বেহালা বাজাতে আসেনি।

আমি চুপ করলুম। বৌদি তার খোঁপাটা খুলে কোঁকড়া চুলগুলি

মেলে দিয়ে উঠে বসে বললে, হয়ে গেল গল্প? মজার অসুখটা কি হল?

ও, মজার অসুখটা; এর পর থেকেই মাথাটা কেমন ধরত, সব সময়ে সেই বেহালার সুরগুলো মাথার মধ্যে রিমঝিম করছে। ভয় হল, মাথাটা খারাপই হয়ে যাবে নাকি। বাবাকে একদিন চুপে চুপে সব কথা বললুম। তখন দাদার এক বন্ধু নতুন ডাক্তারি পাশ ক'রে বেরিয়েছেন। বাবা একেবারে তাঁকে আমার কাছে এনে সব কথা ব'লে দিলেন। আমি ত লজ্জায় মরি। তবে প্রেস্‌কিপসন্‌টার জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ দিতে হবে। তখন ইয়োরোপের খুব বড় এক বেহালাবাদক কলকাতায় এসেছিলেন। নতুন ডাক্তারের উপদেশ হল, রোজ তাঁর বেহালা বাজান শুনে আসতে হবে। আশ্চর্য্য, দিন চার তাঁর বেহালা বাজান শুনে আমার মাথার দপদপানি সেরে গেল। কি মজার অসুখ, না?

বৌদি তার কাল চোখে হাসি-কৌতুকের বিদ্যুৎ ঠিকরে বললে, ও, সেই ডাক্তারটির সঙ্গেই বুঝি ৭ই—

মুখ রাঙা করে বললুম, যাও, আচ্ছা এখনও গান শোনাবে না?

তার দুখানি সুডোল বাহু দিয়ে আমায় জড়িয়ে, লাবণ্যশিখার মত আঙুল দিয়ে আমার গাল টিপে আদর করে বৌদি বললে, বিরহের গান শুনতে ভারি ইচ্ছে করছে? আচ্ছা, একটা শোনাচ্ছি, ভাই। আমি বলছি, তোর বাসর ঘরে সারা রাত গান গাইব। ভয় নেই রে, তোর বিয়ের লুচি না খেয়ে মরছি না, যে আবার ভূত হয়ে গান শোনাতে আসব। আর এখন ত আর একা নও, ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গেই থাকবে। ভয় কি!

হোটেলওয়ালা

সে বছর গ্রীষ্মকালে আমরা জার্ম্মানীতে বেড়াতে গেলুম—সতীশ ঘোষ, সিতাংশু সেন ও আমি। কোল্‌নের অপূর্ব্ব গির্জ্জা; রাইন-নদীতে ষ্টীমারে ভ্রমণ; বন্‌-এ বিটোফেনের বাড়ি; বার্লিন—কাইজারের দম্ভ, জার্ম্মান-জাতির সভ্যতার রূপ, বিজ্ঞানের সাধনা-ক্ষেত্র ভোগলালসার লীলাভূমি বার্লিন; লাইপজিগ; ড্রেসডেনে চিত্রশালা, অপেরা; ম্যুনসেনে এসে ঘোষ আর নড়তে চাইলে না; আমাদের প্ল্যান ছিল ভিয়েনা পর্য্যন্ত যাওয়া যাবে।

সে বললে, বাকী ছুটিটা সে ম্যুনসেনে কাটাবে, সিতাংশুর সঙ্গে গির্জ্জার পর গির্জ্জা ও আমার সঙ্গে চিত্রশালার পর চিত্রশালা ঘুরতে আর সে রাজী নয়; সে জার্ম্মানীতে এসেছে কতকগুলি প্রাচীন কালো পাথরের গির্জ্জা বা মেরী ও বিশুখৃষ্টের রংচঙে ছবি দেখবার জন্য নয়, সে এসেছে 'লাইফ' দেখতে, ম্যুনসেনের বীয়ার ও অপেরা ছেড়ে সে আর কোথাও যাচ্ছে না।

সিতাংশু বললে, আচ্ছা, ভিয়েনাতে নেই যাওয়া হ'ল, কিন্তু রোথেনবুর্গে যেতে হবে; দেখ, বেড্‌ডেকারে লিখছে, রোথেনবুর্গ ইয়োরোপের অতি পুরাতন শহর, মধ্যযুগের এক পরমসুন্দর রূপ কালের শাসন এড়িয়ে স্বপ্নের মত জেগে আছে, যেন সময়ের চলা থেমে গেছে এখানে,—চতুর্দ্দশ পঞ্চদশ শতাব্দীর পরিখা-দেওয়াল-ঘেরা নগর, তোরণদ্বার, গির্জ্জা, দুর্গের ধ্বংসাবশেষ—

ঘোষকে ম্যুনসেনে রেখে আমরা দু-জন রোথেনবুর্গের দিকে যাত্রা করলুম। ঢেউ-খেলান ছোট পাহাড়ের সারি, বার্চ্চ বন, পাইন বনের ঘন রহস্য, তরঙ্গায়িত সবুজ প্রান্তরে গির্জ্জার চূড়া ঘিরে লাল-টালি ছাওয়া ছোট ছোট কুঁড়েগুলি,—ছোটনাগপুরের পার্ব্বত্য সৌন্দর্য্যের সঙ্গে বাংলার স্নিগ্ধতা শ্যামলতা মেশান প্রাকৃতিক দৃশ্যপট। ছোট ট্রেন যখন রোথেনবুর্গে এসে থামল তখন সন্ধ্যা হয়-হয়, সবুজ পাহাড়ের গায়ে থাকে থাকে সাজান লাল রঙের ত্রিকোণ ছাদের বাড়ীর সারি, গির্জ্জার চূড়া, তোরণ, স্তম্ভ সন্ধ্যারাগে ঝলমল আকাশের মায়াপটে আগুনের শিখার মত, যেন সবুজরঙের পেয়ালাতে রাঙা মদ গলিত স্বর্ণের মত টলমল।

সিতাংশু বেডডেকার দেখে ঠিক ক'রে রেখেছিল যে, রাট-হাউসের কাছে 'রাটস্-কেলার' হোটেলে গিয়ে থাকা হবে। কিন্তু হোটেলে গিয়ে জানা গেল, ঘর খালি নেই, আমেরিকান ভ্রমণকারীর দল সমস্ত হোটেল দখল ক'রে বসে আছে। সুটকেস-বাহক কুলিটি বললে, বুর্গটোরের কাছে একটি ভাল হোটেল আছে, তবে সে শহরের শেষ প্রান্তে—'হোটেল সোহো'। এই মধ্যযুগের প্রাচীন শহরে হোটেল সোহো! সেইদিকেই যাওয়া গেল।

'হোটেল সোহোর' ম্যানেজার জানালেন, সেখানেও স্থানাভাব, সেখানেও আর একদল মার্কিনদেশীয় ভ্রমণকারী; আর যা দু-খানা খালি ঘর আছে তা আগামী কল্যের জন্য রিজার্ভ করা রয়েছে। সিতাংশু ম্যানেজারের সঙ্গে রীতিমত চেঁচামেচি সুরু ক'রে দিলে,—দেখুন, আমরা আসছি ভারতবর্ষ থেকে আপনাদের এই পুরাতন

শহর দেখতে, আর আপনি বলছেন, থাকবার জায়গা নেই—অতিথিদের প্রতি জার্ম্মানীর—

এমন সময় ক্রমান্ধকারময় নির্জ্জন পথ কার হাস্যে কেঁপে উঠল, হাস্য নয় অট্টহাস্য। ম্যানেজার বললেন, ওই হোটেলের মালিক আসছেন, ওঁকে বলুন।

ছাই-রঙের স্যুট পরা একটি মোটা লোক আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন পথের বাঁক থেকে, যেন চারিদিকের ছায়া মূর্ত্তিমান্ সরব হয়ে উঠল। লোকটি যেমন স্থূল তাঁর কণ্ঠস্বর তেমনি বাজখাঁই, গাল দুটি ফোলা ফোলা, বড় বড় চোখ দুটি ভাসা ভাসা, ষ্টেজের ভাঁড় বা সার্কাসের ক্লাউনের মত অঙ্গভঙ্গী,—অর্থাৎ জীবনটা একটা পরিহাস, ফূর্ত্তি ক'রে নাও।

অত্যধিক বীয়ার পানে স্ফীত উদর দুলিয়ে লোকটি অট্টহাস্যের সুরে বললেন,—কি ব্যাপার, এত হৈ-চৈ কিসের—হা, হা, শুভসন্ধ্যা বিদেশী অতিথিগণ, রবার্ট নয়মান, হোটেল সোহোর মালিক, আপনাদের ভৃত্য—ব্রেজিল? পর্ত্তুগাল? সিনা—হা হা—

সিতাংশু ক্ষুব্ধস্বরে ব'লে উঠল,—ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ। আমরা আসছি—

সিতাংশুর বাক্যগুলি তাঁর কণ্ঠস্বরে ডুবিয়ে নয়মান বলে উঠলেন—ইণ্ডার—ইণ্ডার—কালকুটা, গুট্—

আমি ধীরে বললুম,—এখন আমরা লণ্ডন থেকে এসেছি, জার্ম্মানী বেড়াতে, আপনার হোটেলে দুই-বিছানা-ওয়ালা একখানা ঘর পাওয়া যাবে কি?

—লণ্ডন? ও লণ্ডন!

লণ্ডন কথাটা শুনে নয়মানের পরিহাস-উজ্জ্বল মুখ কেমন গম্ভীর হয়ে গেল, থিয়েটারের ভাঁড়ের মূর্ত্তি গেল বদলে। ম্যানেজারের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, সোয়ারৎসেনবেয়ার্গ, কোন্ ঘর খালি আছে?

—কোনো ঘর ত খালি নেই।

—কেন, আঠার নম্বর?

—ও ঘর ত কালকের জন্যে রিজার্ভ, এক সুইস্ দম্পতী কাল সকালেই আসছেন।

—আচ্ছা, কাল তাঁদের একটা ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া যাবে, আপনি এঁদের আঠার নম্বরে বন্দোবস্ত ক'রে দিন—আমার লণ্ডনের প্রিয় অতিথিদ্বয়, আপনারা যতদিন খুশী এ হোটেলে থাকুন, এ পুরাতন-শহরে 'লাইফ এন্‌জয়' করবার কিছু নেই, এ লণ্ডন নয়, তবে আমাদের যথাসাধ্য আপনাদের মনোরঞ্জন করবার ব্যবস্থা করব। আসুন, আপনাদের ঘর দেখিয়ে দিচ্ছি।

ডিনার খেয়ে শহরটা একটু ঘুরতে বার হওয়া গেল। আমাদের দেশে সন্ধ্যার রক্তরাগ বড় ক্ষণিক, দিনের আলো হঠাৎ নিবে যায়, রাত্রির অন্ধকারের কালো পর্দ্দা চারিদিক ঘিরে ফেলে। কিন্তু ইয়োরোপে, বিশেষতঃ উত্তর-ইয়োরোপে, গ্রীষ্মকালে সূর্য্যাস্তের পর গোধূলির আলো অনেকক্ষণ থাকে, রাত দশটা-এগারটা পর্য্যন্ত। সেই গোধূলির আলোয় প্রাচীন শহরটি বড় সুন্দর লাগল। সিতাংশুর ইচ্ছা ছিল, দ্বাদশ শতাব্দীর যে এক গির্জ্জার ধ্বংসাবশেষ কাছে কোথায় আছে, তার সন্ধান করবে। আমি বললুম—না, শহরে কোথায় ভাল কাফে আছে দেখ, সেখানে বসা যাবে।

রাত্রে যখন ফিরলুম তখন হোটেল সোহো সরগরম হয়ে উঠেছে ; একতলার সব ঘর আলোয় ঝলমল, বড় খাবার ঘরের মাঝের সব টেবিল সরিয়ে নৃত্যশালা হয়েছে, কাঠের দেওয়াল ও জানালার পাশে মদের পাত্র রাখার ছোট গোল টেবিল ও চেয়ারের সারি সাজান, এক কোণে নৃত্যের বাদ্য বাজছে, আর আমেরিকান ভ্রমণকারীদের দল হাস্যগীত-গল্পগুঞ্জরণের সঙ্গে নানা প্রকার মদ্যপানের অবসরে নৃত্যচটুল পদের আঘাতে কাচের মত মসৃণ কাঠের মেজে সঙ্গীতমুখর ক'রে তুলছে, গ্লাসে গ্লাসে বীয়ারের ফেনা উপ্‌চে পড়ছে, মুখে মুখে হাসি ও গানের উচ্ছ্বাস।

বাদ্যযন্ত্র বেশী নয়,—একটি পিয়ানো, দু'টি বেহালা, একটি হার্প ও দু'টি চেলো। আমাদের হোটেল-স্বামী নৃত্যের তালে দুলে দুলে একটি বেহালা বাজাচ্ছেন, চোখ দু'টি জ্বল্‌-জ্বল্‌ করছে, সান্ধ্য-সজ্জার কালো কোটের লেজের মত পেছনটা বিজয়-পতাকার মত উড়ছে, উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বেহালার ছড়ি টেনে তিনি মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠছেন,—Enjoy ladies and gentlemen enjoy,—Valencia, la-la-la-la ; তাঁর সঙ্গে নৃত্য উল্লসিত নরনারীগণ উজ্জ্বল হাস্যে গেয়ে উঠছেন - Valencia la-la-la la—

সিতাংশু ও আমি বাইরে বাগানে বসলুম। একটু পরে নৃত্যের বাজনা থামল ; যাঁরা নাচছিলেন, সবাই যে-যার চেয়ারে গিয়ে বসলেন, টেবিল থেকে মদের গেলাস তুলে পান করতে লাগলেন, নৃত্যের শ্রম দূর ক'রে আবার নতুন নাচের জন্য বল সঞ্চয় করতে।

হোটেল-স্বামী ঘরের মাঝখানে খালি জায়গাতে তাঁর বেহালা হাতে ক'রে এলেন, সবার প্রতি নত হয়ে অভিবাদন ক'রে ধীরে

বললেন, প্রিয় আমেরিকান অতিথিগণ, ব্যাভেরিয়ার একটি অতি পুরাতন গান আপনাদের বাজিয়ে শোনাচ্ছি, খাঁটি ব্যাভেরিয়ার খাঁটি গ্রাম্য সুর—

বেহালা বাজান সুরু হল, বড় করুণ ক্লান্ত সুর, একটু একঘেঁয়ে, অনেকটা আমাদের ভাটিয়াল সুরের মত, এ গ্রাম্যগীত শতাব্দীর পর শতাব্দী কত কৃষক-কৃষাণীর মুখে মুখে গীত হয়ে এসেছে। হোটেল-স্বামী উদাস চোখে করুণ ভঙ্গীতে বেহালা বাজিয়ে গেলেন, লোকটার মূর্ত্তি একেবারে বদলে গেল, কালো কোটের পেছনটা আর দুলছে না, মাঝে মাঝে কেঁপে উঠতে লাগল।

বেহালা বাজান শেষ হতেই সবাই করতালি দিয়ে উঠলেন। তারপর এক মধ্যবয়স্কা আমেরিকান মহিলা পিয়ানোতে গিয়ে দু-বৎসর ধরে তৎকালিক লণ্ডনে অভিনীত এক অপেরেটার জনপ্রিয় এক গানের ফক্সট্রট্-নৃত্যোপযোগী সুর বাজাতে আরম্ভ করলেন, তাঁর বব্‌ড্‌ চুল দুলিয়ে,—

আবার নৃত্য সুরু হল।

আমরা যে বাইরে বাগানে বসে আছি, তা হোটেল-স্বামীর চোখ এড়ায়নি। তিনি তাঁর বেহালাটি বগলে নিয়ে আমাদের কাছে ছুটে এলেন,—শুভ সন্ধ্যা, ভারতীয় প্রিয় অতিথিদ্বয়, আপনারা বাহিরে বসে কেন? সম্মুখে এমন নৃত্যগীতের আনন্দ-নদী প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে, আর আপনারা তীরে বসে শুধু সুখলহরীর লীলা দেখবেন! ভাসিয়ে দিন্ তরী এ স্রোতে—

সিতাংশু হেসে বললে,—আমরা বড় শ্রান্ত।

—শ্রান্ত! সব শ্রান্তি দূর হয়ে যাবে, আসুন নৃত্যশালাতে, কি

পান করবেন ?—বীয়ার, ম্যুনসেন বীয়ার, শাম্পেন্, লিকয়র্,
ক্লারেট, সেণ্ট জুলিয়ন—

নৃত্যগৃহে প্রবেশ করতে এক জার্ম্মান মহিলা আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন অভ্যর্থনা করতে। লম্বা ছিপছিপে, কালো সাটিনের গাউনের রেখা তীরভূমিতে ভেঙে-পড়া ক্লান্ত তরঙ্গের মত ; টানা চোখ দু'টির তারা ঘননীল, যেন ব্লুবেল ফুল ; মুখখানি ফ্যাকাসে, শরত-শেষের পতনোন্মুখ বৃক্ষপত্রের মত সোনালী। হোটেল-স্বামী পরিচয় করিয়ে দিলেন,—ফ্রাউ আমেলিয়া মাগ্‌ডালেন নয়মান, আমার স্ত্রী ; এঁরা প্রিয় ভারতীয় বন্ধু, লণ্ডন থেকে এসেছেন, হের্ সেন, হের্ চৌতুরী (চৌধুরী)।

সিতাংশু সহজেই আমেরিকান দলের সঙ্গে মিশে গেল। ফ্রাউ নয়মানের সঙ্গে এক পালা ফক্সট্রট নেচে আমি বললুম—চলুন, বাগানে বসা যাক্, ঘরটা বড় গরম।

ঘরে স্থানাভাবও ছিল। দু-জনে বাগানে এসে বসলুম। নৃত্যের উত্তেজনায় ফ্রাউ নয়মানের পীতপত্রবর্ণের মুখখানি একটু দীপ্ত রুক্ষ হয়ে উঠেছিল, বাহিরে এসে শীতল কোমল হয়ে এল।

ধীরে তিনি বললেন,—আজকের আমেরিকানগুলি বড় বেশী হৈ-চৈ করছে। এত গোলমাল আমার ভাল লাগে না।

আমি বললুম, এরকম এক প্রাচীন শহরে এসে লণ্ডন প্যারিসের মিউজিক-হলের নতুন গান শুনতে বা চার্লষ্টোন্ নাচ দেখতে ইচ্ছে করে না, তার চেয়ে আপনার স্বামী যে প্রাচীন জার্ম্মান গ্রাম্য গীত বাজালেন, বড় ভাল লাগল।

—দেখুন, আজকালকার দিনে পবিত্র বলে কিছু নেই, এই

শহরটা যে একটা মিউজিয়মের মত করে রাখা হয়েছে, তা শুধু নানা দেশের ভ্রমণকারীদের কাছ থেকে টাকা লুটবার জন্যে, এ আমার ভাল লাগে না।

—আপনার স্বামী কিন্তু আমোদে খুব মাততে পারেন।

—ওঁর ঐ হৈ-চৈ করাটা অত্যধিক মদ খাওয়ার জন্যে, তা ছাড়া উনি ব্যাভেরিয়ান্—

—আপনাকে দেখে উত্তর-জার্ম্মানীর মনে হয়।

—ঠিক বলেছেন, আমার বাড়ি ল্যুবেকে।

—কিছু মনে করবেন না, অনেক জার্ম্মান উপন্যাসে পড়েছি, উত্তর-জার্ম্মানদের সঙ্গে ব্যাভেরিয়ানদের মানসিক প্রকৃতির বড় প্রভেদ, সেজন্য তাঁদের মধ্যে বিবাহ প্রায় সুখের হয় না।

—অমন কথা সব ক্ষেত্রে বলা যায় না। তবে কথাটা খুবই সত্য।

আমার মন্তব্য এত ব্যক্তিগত হওয়া উচিত ছিল না ভেবে লজ্জিত হয়ে একটু চুপ করলুম। সিগারেট কেসটা খুলে ফ্রাউ নয়মানের সম্মুখে ধরে বললুম—সিগারেট !

—ধন্যবাদ, আমি ধূমপান করি নে, আপনি স্বচ্ছন্দে খেতে পারেন।

একটি সিগারেট ধরালুম। ফ্রাউ নয়মান্ ক্লান্তস্বরে বলতে লাগলেন,—আপনি হয়ত ভাবছেন, আমি কেন এ-রকম বিবাহ করেছি, বিবাহ আমি স্বচ্ছন্দচিত্তেই করেছি, আমাদের বিবাহের একটা ইতিহাস আছে, আমার স্বামী গত মহাযুদ্ধের সময় আমার দাদার সঙ্গে একসঙ্গে বন্দী ছিলেন—

—বন্দী? কোথায়?

—আমি হচ্ছি আমার স্বামীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। যুদ্ধের আগে আমার স্বামী লণ্ডনে থাকতেন। সেখানে সোহোতে তাঁর এক রেস্তোরাঁ ছিল--

—সোহোতে! সেজন্তেই বুঝি এ হোটেলের নাম হোটেল সোহো।

—ঠিক বলেছেন। লণ্ডনে সোহোতে তাঁর রেস্তোরাঁ ছিল, তিনি এক ইংরেজ মেয়েকে বিবাহ করে সেখানে ঘর-সংসার পেতে বেশ স্থখেই ছিলেন—তারপর যুদ্ধ বাধল, ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট তাঁকে বন্দী করলে জার্ম্মান বলে, আইল-অফ্-মানেতে রাখলে বন্দী ক'রে, তাঁর দোকান বাজেয়াপ্ত হ'ল, আর তাঁর স্ত্রী কোর্টে ডিভোর্সের জন্তে দরখাস্ত করলেন, তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গেল।

একটু থেমে ফ্রাউ নয়মান বলে যেতে লাগলেন,—যুদ্ধের পর উনি মুক্তি পেলেন, কিন্তু তখন তিনি ভাঙা মানুষ, মস্তিষ্কেরও একটু বিকৃতি হয়ে গেছ্‌ল, সব সময়ে বিমর্ষ। আমার দাদাও ওঁর সঙ্গে আইল-অফ্ মানেতে বন্দী ছিলেন; তিনি ওঁকে আমাদের বাড়ী নিয়ে এলেন; স্বদেশের অবহাওয়াতে আমাদের বাড়ীর প্রীতিতে সেবায় রবার্ট ধীরে ধীরে সেরে উঠল, আমাদের নূতন প্রেমের জীবন আরম্ভ হল। কিন্তু তখন কোন কাজকর্ম্ম পাওয়া শক্ত, আমার বাবার যা টাকা ছিল, সব দিয়ে তিনি যুদ্ধের ঋণ কিনেছিলেন, যুদ্ধের পর আমরা কপর্দ্দকহীন। এমন সময় আমার এক দূরসম্পর্কীয় দাদামশাই মারা গেলেন, তাঁর দুই ছেলে যুদ্ধে মরেছে, সেই শোকে বৃদ্ধ মারা গেলেন; উইলে তিনি আমাকে এই

হোটেল-বাড়ীখানা দিয়ে গেলেন, আমরা নূতন বিবাহ ক'রে একটা আশ্রয় পেলুম, কাজ পেলুম। তারপর এই কয় বছরে আমার স্বামীর তত্ত্বাবধানে হোটেলের নাম প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে; আমাদের চলে যাচ্ছে; অতিথিদের মনোরঞ্জন করতে উনি ওস্তাদ—তবে আমার মাঝে মাঝে এত হৈ-চৈ ভাল লাগে না। কিন্তু জীবনটা ত নিছক সুখের জন্য নয়, দেখুন—

ফ্রাউ নয়মান শ্রান্ত হয়ে চুপ করলেন। আমি বললুম,—আপনার জন্যে কোন পানীয় অর্ডার দিতে পারি?

—না, ধন্যবাদ, কিছু না, আপনি কিছু পান করুন।

—আমি একটা কফি নেব।

—আচ্ছা, আমার জন্যও একটা কফি বলে দিন।

ঘরের মধ্যে বাদ্যযন্ত্র সব নৃত্যের সুরের ঝঞ্চনায় মেতে উঠেছে, হের্ নয়মান্ সবাইকে মনোরঞ্জন করবার জন্যে একটি জার্ম্মান গান গাইছেন—Ich habe mein Herz in Heidelberg verloren (আমি আমার হৃদয় হারিয়েছি হাইডেলবেয়ার্গে); মাঝে মাঝে রসিক টিপ্পনীর সঙ্গে গানের পদ ইংরেজীতে অনুবাদ ক'রে দিচ্ছেন বাউলের মত হেলেদুলে নেচে, তাঁর মাথার টাকটা চক্‌চক্ করছে; নৃত্যপাগল নরনারীদলে হাসির রোল উঠছে।

বাহিরে আমরা দু-জন চুপ ক'রে বসে কফি পান করতে লাগলুম, পিছনে পঞ্চদশ শতাব্দীর বুরুজমণ্ডিত নগরতোরণদ্বার সঙ্গীনধারী নিশীথ প্রহরীর কালো ছায়ার মত, নির্ম্মল আকাশে তারাগুলো দপ্‌দপ্ করতে লাগল, বহুশতাব্দীমলিন নগরপ্রাচীরে জ্যোৎস্নার মৃদু আলো।

নৃত্যশালায় হের্ নয়মানের আনন্দ-নৃত্য বড় করুণ মনে হল, তাঁর এ নাচগান কেবল মাত্র অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য নয়, কোন নিগূঢ় ব্যথাকে হাসির উচ্ছ্বাসে ভোলবার চেষ্টা।

নাচঘর থেকে সিতাংশুকে টেনে নিয়ে যখন শুতে গেলুম তখন রাত একটা। নয়মান্ বললেন, এতক্ষণে ত কিছু জমেছে, এর মধ্যে শুতে যাবেন! কিন্তু দেখলুম, সিতাংশু এ প্রাচীন নগরের পুরাতত্ত্ব আলোচনা ছেড়ে তার নৃত্যসঙ্গিনীর সঙ্গে কক্‌টেলের মিশ্রণ-তত্ত্ব সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে সুরু করেছে, তাতে আর অধিক জ্ঞানলাভে বিপদ হতে পারে।

পরদিন সারাদিন ঘুরে রোথেনবুর্গ দেখা গেল। বিকেলে চা খাবার পর সিতাংশু বললে,—আমার ভাই দেশে চিঠি লিখতে হবে, আমি আর বেরুবো না।

আমি নয়মানের সঙ্গে একটু বেড়াতে বের হলুম।

—আজ সকালে আপনাদের দেখাশোনা করতে পারিনি, ক্ষমা করবেন, কাল রাত আড়াইটে পর্য্যন্ত নৃত্যগীত চলেছিল—

—আজ দুপুরে ত আমেরিকান দলটি চলে গেলেন।

—হাঁ, আজ রাতটা তেমন জম্‌বে না, তবে কাল আর একদল আসছেন। আমাদের পুরাতন কবরস্থান দেখেছেন? বড় সুন্দর জায়গা, অমন ফুলের শোভা কোথাও দেখতে পাবেন না।

নগরের পরিখার অপর ধারে দিগন্তেমেশা ঢেউখেলান মাঠের মধ্যে গোরস্থান, যেমন নির্জ্জন তেম্‌নি নানা রঙের ফুলের শোভায় অপরূপ; সবুজ মাঠে যেন রঙের হোলিখেলা চলেছে, কত রঙের কত রকমের অপূর্ব্ব ফুল সব চারিদিকে ফুটে— শুভ্র লিলি অফ্ দি

ভ্যালি, রূপকথার পরীদের ঘণ্টার মত ; নানাজাতীয় বন্য গোলাপ ডগ্ রোজ, এগ্‌লেনটাইন ; লাল ক্লোভার, সাদা ক্লোভার ; ভ্যালেরাইন, চুনীর মত লাল ; ফক্সগ্লাভ, তার রাঙা পাপড়িতে সাদা-হলদে রঙের ফুট্‌কি।

নয়মান এক ভাঙা পাথরের ওপর বসলেন, চারিদিকের ফুলের রঙের মেলার দিকে চেয়ে বললেন,—এখানে বসে সূর্য্যাস্ত দেখতে বড় ভাল লাগে।

অবাক হয়ে তাঁর দিকে চাইলুম। ছাই রঙের স্যুট-পরা শান্ত-মূর্ত্তি, করুণ মুখ, ক্লান্ত কণ্ঠস্বর, লোকটা একেবারে বদলে গেছে, অনেক বুড়ো দেখাচ্ছে, এই উদাস রূপ দেখে কে ভাব্‌তে পারে এই লোকটা কাল রাত আড়াইটে পর্য্যন্ত নেচে গেয়ে ভাঁড়ামি করেছে। চুপ ক'রে তাঁর পাশে বসলুম।

যেন আমাকে নয়, অপরাহ্ণের ম্লান আলো ভরা আকাশ-প্রান্তরের প্রতি লক্ষ্য ক'রে তিনি বলে যেতে লাগলেন,—আমার মেয়ে ফুল ভালবাসত, বড্ড ভালবাসত। হাঁ, আমার একটি মেয়ে আছে, আমি লণ্ডনে যে ইংরেজ-ললনা এলিজাবেথকে বিবাহ করেছিলুম, সে-ই তার মা—সে মা মেয়ে যে কোথায় আমি তা কিছুই জানি নে—হের্ চৌতুরী, গ্রেট্‌সেন এই ফক্সগ্লাভ বড় ভালবাসত, আর ব্লুবেল আর—

ধীরে তিনি পকেট থেকে একটি ফটো য়্যালবাম বার ক'রে নিজে একবার সব পাতা উল্টে দেখে আমার হাতে দিলেন। দেখলুম, গ্রেট্‌সেন নাম্নী একটি ছোট মেয়ের নানা বয়সের ফটোতে ভরা ; ছ'মাসের, এক বছরের, দু-বছরের, প্রতি জন্মদিনে তার ফটো নেওয়া

হয়েছে, বছরের পর বছর ; এগারো বছরের পর আর ফটো নেই ; শেষের অনেকগুলি ধূসর রঙের পাতা খালি।

হের্ নয়মান্ বলে যেতে লাগলেন,—যখন যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল তখন গ্রেট্‌সেন্ বারোয় পড়েছে, নভেম্বরে তার জন্মদিন ছিল, তার আগেই আমি বন্দী হলুম। বিবাহবিচ্ছেদের পর তার মা তার অভিভাবিকা হলেন, আমার আর কোন সম্পর্ক, কোন দাবী রইল না। যুদ্ধের শেষে যখন জার্ম্মানীতে আসার অনুমতি পেলুম, আমি একবার আমার মেয়েকে দেখতে চেয়েছিলুম, আধ ঘণ্টার জন্য ; পনেরো মিনিটের জন্য ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে আমাদের দেখা হয়েছিল, তখন তার মা আবার বিবাহ করেছেন ; তার স্বাস্থ্য বেশভূষা দেখেই বুঝলুম তার আর তেমন যত্ন আদর হয় না। বড় আদরের মেয়ে ছিল। আমি কেঁদে ফেললুম ; সে নতমুখে নীরবে দাঁড়িয়েছিল, আমার কান্না দেখে বললে, বাবা, তুমি কেঁদো না, আমি ভালই আছি, তুমি জার্ম্মানীতে ফিরে যাও, সেখানে নূতন জীবন আরম্ভ কর, আমি যখন সাবালিকা হব তখন নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে জার্ম্মানীতে গিয়ে দেখা করব, এরা এখন ত আমায় যেতে দেবে না—

নয়মানের কণ্ঠ চোখের জলে ভিজে স্তব্ধ হয়ে গেল ; চারিদিকে নিস্তব্ধ গোধূলির আলো। চুপ ক'রে বসে রইলুম।

দূরে গির্জ্জার ঘণ্টা বেজে উঠল সন্ধ্যারতির মত। নয়মান চমকে উঠলেন,—চলুন, আর দেরী নয়—আজ সন্ধ্যার ট্রেনে কয়েকজন সুইস্ আস্‌ছেন।

পথে যেতে যেতে হঠাৎ আমার হাতটা জড়িয়ে ধ'রে কাতর-

স্বরে তিনি বলেন উঠলেন,—দেখুন হের্ চৌতুরী, আপনি যদি আমার একটি কাজ করতে পারেন চিরজীবন আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। দেখুন, লণ্ডনে গিয়ে আমার মেয়ের সন্ধান করতে হবে আপনাকে, এ নভেম্বরে সে সাবালিকা হবে, সে যদি আমার ঠিকানা জানতে পারে, নিশ্চয় সে আসবে আমার কাছে ছুটে। লণ্ডন থেকে এখানে বড় কেউ আসে না, আর আমার লণ্ডনের পুরাতন বন্ধুদের সঙ্গে কোন যোগ নেই, আমার মেয়েকে খুঁজে বার করতে হবে—জানি, বার করা খুব শক্ত। সেই জন্যেই ত আপনাকে বলছি, আমার জন্য সে প্রতীক্ষা করছে—

ধীরে বললুম,—আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব, কিন্তু অত বড় শহরে এক অজানা মেয়েকে বিনা ঠিকানায় খুঁজে বার করা—

—খুব সম্ভবপর হবে! আমার মেয়ের নাম,—মার্গারেট এথেলমান, লণ্ডনে আমি শুধু 'মান্' লিখতুম। কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদের পর তার মা তার পিতার নাম নেন, ওয়েব ; এখন তিনি বিবাহ করেছেন একজন ব্রাউনকে। খুব সম্ভব আমার মেয়ের নাম বদল হয়েছে, মার্গারেট ওয়েব—এই ফটোখানি রাখুন আপনার কাছে, ব্লণ্ড, সুগভীর নীল চোখ—

—আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। তার বেশী আর কি বলতে পারি?

—ধন্যবাদ, হের্ চৌতুরী, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।

পরদিন সকালে বিদায় নেবার সময় ফ্রাউ নয়মান্ স্যাণ্ডউইচ কেক ইত্যাদিভরা প্যাকেটটি আমাদের হাতে দিয়ে বললেন,—হের্ চৌতুরী, মার্গারেটের সন্ধান করবেন নিশ্চয়। আমার একটি

ছেলে হয়েছিল, সে দেড় বছরে মারা গেছে, আর আমার ছেলেমেয়ে হবার সম্ভাবনা নেই। মার্গারেটকে যদি পাই, নিজের মেয়ের মত ক'রে তাকে রাখব।

লণ্ডনে ফিরে এসে একমাত্র কাজ হ'ল মার্গারেটকে খুঁজে বার করা। কিন্তু সে লণ্ডনে, না কানাডায়, না অষ্ট্রেলিয়াতে; সে জীবিতা কি মৃতা, তা কে জানে? বৃথা এ সন্ধান। তবু রীতিমত খুঁজতে সুরু করলুম।

টাইম্‌স্ পত্রিকা, ডেলি টেলিগ্রাফ, ডেলি এক্সপ্রেস, লণ্ডনের প্রধান প্রধান দৈনিক সংবাদপত্রের ব্যক্তিগত কলমে ছাপালুম,— মিস্ মার্গারেট এথেলমান্ ওরফে ওয়েব্ তোমার পিতা তোমার সহিত দেখা করবার জন্যে বিশেষ অধীর, তুমি শীঘ্র—নম্বর পোষ্ট বক্সে চিঠি লিখবে।

একমাস কেটে গেল, কোন চিঠি এল না।

ইংরেজ ও ভারতীয় সকল বন্ধু পরিচিত-পরিচিতাদের ব'লে দিলুম, দেখ, মার্গারেট ওয়েব ওরফে মান নাম্নী কোন মেয়ের সঙ্গে যদি পরিচয় হয় বা তার খবর পাও, তৎক্ষণাৎ আমাকে জানাবে। সবাই সিদ্ধান্ত ক'রে নিলে, নিশ্চয়ই কোন প্রেম-ঘটিত ব্যাপার। মুচকে হেসে বললে, নিশ্চয়ই, মার্গারেট ওয়েবের দেখা পেলেই ধরে নিয়ে আসব তোমার কাছে, কেউ বুঝি তাকে নিয়ে পালিয়েছে!

আমার অনুসন্ধান ব্যাপারটা এত জানাজানি হয়ে গেল যে, পথে কোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলেই প্রশ্ন করে, কি হে, মার্গারেট

ওয়েব ওরফে মানের দেখা পেলে? একদিন স্কটল্যাণ্ড ইয়াড থেকে এক লোক এসে হাজির, তাঁকে সব কথা খুলে বললুম, দু-তিন দিন ইয়ার্ডের ডিটেকটিভ আপিসে হাঁটাহাঁটি করলুম, তারা কোন সন্ধান দিতে পারলে না।

প্রতি সপ্তাহে হের্ নয়মানকে চিঠি লিখতুম, সন্ধান চলছে, শীঘ্রই খোঁজ পাওয়া যাবে। কিন্তু তিন মাস কেটে গেল, কোথাও কোন খোঁজ পাওয়া গেল না।

শরৎকাল শেষ হয়ে শীতকাল এল। সকালে ব্রেকফাষ্ট খেয়ে ড্রয়িংরুমে আগুনের পাশে ব'সে কলেজপাঠ্য একখানি পুস্তক পড়বার চেষ্টা করছি, মেড এসে একখানি চিঠি দিয়ে গেল। খুলে দেখি ফ্রাউ নয়মানের চিঠি, লিখেছেন,—মার্গারেটের সন্ধান ত এতদিনেও পাওয়া গেল না, এদিকে মার্গারেটের কথা ভেবে ভেবে আমার স্বামীর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেছে; তিনি কিছুই খেতে চান না, বলেন, মার্গারেট হয়ত কোথাও না খেতে পেয়ে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার বি-পিতা তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, হয়ত লণ্ডনের কোন স্লামে সে অসহায়া। তাঁর সকল আমোদপ্রমোদ রঙ্গ চলে গেছে, তা ছাড়া এখন ভ্রমণকারীদের দলও বড় আসে না। আমার স্বামী সারাক্ষণ বিমর্ষভাবে বসে ভাবেন ও মদ খান, এরকম ক'রে কিছুদিন গেলে, মার্গারেটের দেখা না পেলে, তাঁর মস্তিষ্কের বিকৃতি হবে। এদিকে কিছু দেখেন শোনেন না বলে হোটেল চালান দায়।

চিঠিটা পড়ে মন বড় খারাপ হ'ল; নভেম্বরের লণ্ডনের কালো আকাশ আরও কালো বিষণ্ণতাময় মনে হ'ল, যেন রাতে ও প্রভাতে

কোন তফাৎ নেই। কি করা যায় ভাবছি, দ্বারে সজোরে করাঘাত হল।

—কাম-ইন্।

—হ্যালো চৌ, গুডমর্ণিং!

—হ্যালো মেরী! সকালে যে, মভ-রঙের ফ্রকটিতে তোমায় বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে, এ সবুজ ফেণ্টের টুপি কবে কেনা হল? তার সঙ্গে কালো ভেলভেটের রিবন, বেশ মানিয়েছে।

—আমায় কন্‌গ্রাচুলেট কর, অবশেষে আমরা এন্‌গেজ্‌ড্ হয়েছি।

—সত্যি!

মেরী মেকলে ছিল সতীশ ঘোষের প্রেমিকা। মেরী বলত সতীশ তার ফিয়াঁসে, আর সতীশ বলত মেরী তার বান্ধবী মাত্র। তাদের মান-অভিমানের অনেক ঝগড়া আমাকে মিটমাট ক'রে দিতে হয়েছে।

—শোন, আজ পার্ক রেস্তোরাঁতে আমাদের এন্‌গেজমেণ্ট-উৎসব উপলক্ষ্যে একটা ডিনারেট করতে হবে, তার সব ব্যবস্থা করা তোমার ওপর, সতীশকে দিয়ে ওসব হবে না—কিন্তু তোমায় কেমন বিমর্ষ দেখাচ্ছে, তুমি তোমার সেই এটার্‌নাল মার্গারেটের কথাই ভাবছ নিশ্চয় ভুলে যাও তাকে, তোমার মত ছেলেকে যে এমন ক'রে ফেলে যেতে পারে!

—মেরী, ব্যাপারটা তোমরা জান না, শোন।

মেরীকে সব কথা খুলে বললুম, ফ্রাউ নয়মানের চিঠিখানাও দেখালুম। সে বিষণ্ণ হয়ে উঠল, চিঠি পড়ে তার চোখে জল এল।

শৈশবে সে মাতৃহারা, পিতার আদুরে আবদারে মেয়ে ছিল, এক বৎসর হ'ল তার পিতা মারা গেছেন।

মেরী বললে, আচ্ছা, মার্গারেটের ফটো তোমার কাছে আছে?

নয়মান্ যে ফটোখানি দিয়েছিলেন, সর্ব্বদা সেটি পকেটেই থাকত, মেরীকে দিলুম।

ফটোটি কিছুক্ষণ চুপ করে দেখে মেরী বললে, দেখ, আশ্চর্য্য আমার মুখ চোখের সঙ্গে মার্গারেটের অনেক মিল, নয়? মনে হয়, আমার ছেলেবেলার ফটো।

—হাঁ, আশ্চর্য্য।

—তুমি এক কাজ কর, তুমি লিখে দাও, তুমি মার্গারেটের সন্ধান পেয়েছ, আমার একখানা ফটোও পাঠিয়ে দাও, আমি মার্গারেটের নাম ক'রে একখানা চিঠিও লিখে দিতে রাজী আছি।

—প্রস্তাবটা লোভজনক, কিন্তু—

—কিন্তু কি? তোমরা সব ধর্ম্মপুত্র? জীবনে কখনও মিথ্যা কথা লেখনি, না লোক ঠকাওনি! তোমরা যে কত মিথ্যা ভালবাসার ভাণ করে কত সরলা তরুণীদের প্রতারণা করেছ তার হিসাব যদি করা যায়—

—কাকে প্রতারণা করেছি আমি!

—ক্ষমা কর, আমি ব্যক্তিগতভাবে কিছু বলছি নে; কিন্তু এখন হের্ নয়মানকে বাঁচান বিশেষ দরকার; বিশেষতঃ একবার তাঁর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছিল, আবার ঘটবার খুবই সম্ভাবনা। তুমি এখুনি চিঠি লিখে দাও, এ চিঠি না লিখলে আজ আমার উৎসবে আমি কোন আনন্দ পাব না।

হের্ নয়মানকে চিঠি লিখলুম, মার্গারেটের সন্ধান পেয়েছি ; সে লণ্ডনে আছে, ভালই আছে। তবে তার সঙ্গে দেখা করা বা পত্র বিনিময় করা এখন যুক্তিযুক্ত নয়। তার এক বন্ধুর কাছে সব খবর পাওয়া গেছে, সে বন্ধুটি তার এখনকার একটি ফটোও দিয়েছেন, কিন্তু তার ঠিকানা বলতে রাজী নন।

পর সপ্তাহে ফ্রাউ নয়মান্ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ক'রে চিঠি দিলেন। তাঁর স্বামী অনেকটা সুস্থ, কিন্তু তাঁর মনে কেমন ধারণা হয়েছে মার্গারেটের বড় অসুখ। এ আইডিয়া তাঁর মন হতে কিছুতেই দূর হচ্ছে না।

মার্গারেটের কুশলসংবাদ দিয়ে আবার চিঠি দিলুম।

ডিসেম্বরে লণ্ডনে শীত দারুণ হয়ে উঠল। খৃষ্টমাসটা ফ্রান্সে কাটাবার জন্যে এক বন্ধুর নিমন্ত্রণ পাওয়াতে লণ্ডন ছেড়ে প্যারিস গেলুম। জানুয়ারীর মাঝামাঝি যেদিন সকালে লণ্ডন ফিরলুম, পথঘাট ফগে ভরা। বাড়িতে পৌছাতেই মেড এসে এক টেলিগ্রাম দিলে, বললে, টেলিগ্রাম দু-দিন হল এসেছে, আমার ঠিক ঠিকানা জানা ছিল না বলে পাঠান হয় নি। টেলিগ্রাম খুলে দেখি নয়মানের টেলিগ্রাম, লিখেছেন—মার্গারেট কেমন আছে? বড় চিন্তিত। শীঘ্র জানাবেন তার আরোগ্যলাভ সম্বন্ধে ডাক্তারদের মত কি?

টেলিগ্রাম পড়ে হতভম্ব হয়ে গেলুম। নয়মান কি সত্যিকার মার্গারেটের সন্ধান পেয়েছেন? সে কি সত্যই অসুস্থা? তাড়াতাড়ি মেরী মেকলেকে টেলিফোন করলুম, কেমন আছ তুমি?—

—আমি খুব ভাল আছি। আজ গেইটিতে আসছ ত?

—ইচ্ছে আছে ; শোন হের্ নয়মান—

টেলিগ্রামের কথা তাকে বললুম।

সে উত্তর দিল, আচ্ছা আমি যাচ্ছি শীগগীর, তুমি ততক্ষণ বিশ্রাম করে নাও।

দাড়ি কামিয়ে হাত মুখ ধুয়ে বেশ বদল ক'রে ঘরেতেই ব্রেকফাষ্ট আনতে বললুম। মেড এসে বললে, মিস মেকলে নীচে আপনার জন্যে প্রতীক্ষা করছেন।

—তাঁকে অনুগ্রহ ক'রে ড্রয়িংরুমে একটু বসতে বল।

ডিম ও মাংসের ডিসটা অর্দ্ধেক শেষ করেছি, মেড ভীত মুখে ঝড়ের মত ঘরে প্রবেশ ক'রে উদ্বেগের সঙ্গে বললে,—মিষ্টার চৌধুরী, প্লিজ শীগগীর নীচে যান।

—কি হয়েছে ?

—আপনার সঙ্গে এক ভদ্রলোক দেখা করতে চান।

—তাঁকে বসাও ড্রয়িংরুমে।

—তাঁকে ড্রয়িংরুমে বসিয়েছিলাম - তিনি অদ্ভুত রকমের। মিস্ মেকলেকে কি বলেছেন, তাঁর গায়ে হাত দিতে গেছেন, ভয়ে মিস্ মেকলে খাবার ঘরে পালিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে আছেন, আর ভদ্রলোকটি ড্রয়িংরুমে বসে অদ্ভুত শব্দ করছেন—বিদেশী—এই তার কার্ড—

কার্ডে লেখা—রিচার্ড নয়মান্!

ব্যাপারটা বিদ্যুতের মত মনে চম্‌কে উঠল। টেলিগ্রামের উত্তর না পেয়ে নয়মান লণ্ডনে ছুটে এসেছেন—ড্রয়িংরুমে মেরীকে তাঁর মেয়ে মনে করে আদর করে ধরতে গেছেন।

মেডকে বললুম, মিস্ মেকলেকে বল, তিনি অনুগ্রহ করে তাড়াতাড়ি তাঁর বাড়িতে চলে যান, টেলিফোনে আমি সব জানাব।

ড্রয়িংরুমে ছুটে গেলুম। দেখি পিয়ানো-টুলের ওপর বসে হের্ নয়মান্ শিশুর মত ফুঁপিয়ে কাঁদছেন, ধূলো-ভরা কালো এক ফার ওভারকোটে সমস্ত দেহ আবৃত, মাথায় পুরাতন এক ধূসরবর্ণের টুপি, হাতে ভিজে ছাতা, মলিন শুষ্ক মুখ দাড়িভরা, শুধু চোখ ত্-টো আর নাকের ডগা রাঙা টকটক্ করছে।

ধীরে বল্লুম, হের্ নয়মান, আজ সকালে প্যারিস থেকে এসে আপনার টেলিগ্রাম পেলুম। আপনার মেয়ের কোন অসুখের সংবাদ আমি ত পাইনি ; কে আপনাকে এ খবর দিলে? আপনি কাঁদছেন কেন?

ভাঙাগলায় নয়মান্ বলে উঠলেন, আমার মেয়ে—আমার মেয়ে আমাকে চিনতে পারল না? আমাকে পিতা বলে অস্বীকার করলে বুঝতুম, কিন্তু বললে,—আমি তোমায় চিনি না!

—আপনি ভুল করেছেন, আপনি এখানে যাকে দেখেছেন, সে আপনার মেয়ে নয়।

—আমার মেয়ে নয়! আমার মেয়েকে আপনার কাছ থেকে চিনতে হবে? সেই চোখ, সেই কথা বলার ধরণ, সেই ঘাড় নাড়বার ভঙ্গী—আমার মেয়ে নয়! বললে—আমি তোমায় চিনি না।

—আমি সত্যি বলছি, আপনি ভুল করেছেন।

—ভুল করেছি? তাহলে আমার মেয়ে কোথায়?

—আমি এইমাত্র লণ্ডনে আসছি, আপনার মেয়ে যে কোথায় তা ঠিক বলতে পারছি নে, বোধ হয় লণ্ডনে নেই।

—আমি কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পারছি নে। আমি বেশ অনুভব করছি, তার অসুখ করেছে, সে হাসপাতালে, ভারি অসুখ, মাঝে মাঝে আমায় ডাকছে, বাবা বাবা! অথচ এই ড্রয়িংরুমে যাঁকে দেখলুম আমার মেয়ে বলেই মনে হল।

—আপনি শান্ত হয়ে বিশ্রাম করুন, সব বুঝতে পারবেন।

ধীরে নয়মানের টুপি ওভারকোট খুলিয়ে রাখলুম। সোফায় বসালুম। মেডকে কিছু খাবার ও কফি আনতে বললুম। ইংলিশ ব্রেকফাষ্ট খেয়ে নয়মান কিছু প্রকৃতিস্থ হলেন। ভাগ্যক্রমে বাড়িতে একটা শোবার ঘর খালি ছিল; সে-ঘরে বিশ্রামের ব্যবস্থা ক'রে দিলুম। বিছানাতে শুয়েই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। সারাদিন অকাতরে ঘুমোলেন। চার দিন চার রাত তাঁর ঘুম হয় নি।

দাড়ি কামিয়ে স্নান ক'রে সান্ধ্য-বেশ প'রে নয়মান্ যখন সন্ধ্যাবেলায় আমার ঘরে এলেন, একেবারে নূতন মানুষ, যেন কোন তরুণ জার্ম্মান লণ্ডন-জীবন উপভোগ করতে এসেছেন।

—হের্ চৌতুরী, রাতটা একটু 'এন্‌জয়' করতে বার হওয়া যাক, আসুন, সোহোতে আমার কয়েকটি মদের দোকান জানা আছে, চমৎকার মদ!

সোহোতে এক ইতালীয়ান রেস্তোরাঁতে বেশ ভাল ক'রে খাওয়া গেল। নয়মানের ইচ্ছা ছিল, তারপর কোন মিউজিক-হল ও নৃত্যশালাতে যাওয়া, অথবা সোহোর মদ্যশালাগুলি পরিদর্শন করা। আমি তাঁকে টেনে কভেণ্টগার্ডেন অপেরাতে নিয়ে গেলুম।

এক ইতালীয়ান দল সে রাতে ভেয়ারদির রিগোলেত্তো অভিনয় করছিল।

অপেরা দেখার পর থিয়েটার-পাড়ার এক কাফে-রেস্তোরাঁতে এসে বসা গেল। খাওয়াটা নয়মানের উপলক্ষ্য মাত্র্য, মদ্য পানই উদ্দেশ্য; একটা লোক যে কত রকমের মদ কত পরিমাণে পান করতে পারে তা দেখে অবাক হলুম।

—গুট্, সেয়ার গুট্ হের্ চৌতুরী!

—ভাল লাগছে মদটা।

—ইয়া! লণ্ডনেও ভাল মদ মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। বেশ, খুব ভাল, I am happy with life—খুব ভাল—আপনি বলছেন ওই মেয়েটি আমার মেয়ে নয়, গ্রেট্সেন নয়, বেশ, মেনে নিলুম আপনার কথা—ও আমার মেয়ে নয়—তাহলে আমার মেয়ে কোথায়—আপনি বলছেন, জানি নে, বোধ হয় লণ্ডনের বাইরে—আপনি জানেন না, কারণ আজ সকালে আপনি প্যারিস থেকে লণ্ডনে এসেছেন, বেশ, মেনে নিলুম—আপনি তার কোন অসুখের খবর পান নি, খুব ভাল—ও মেয়েটি আমাকে বাবা বলে চিনতে চাইল না, তা যখন সে আমার মেয়ে নয় তখন কি ক'রে আমাকে পিতা বলে চিনবে—ভাল, খুব ভাল হের্ চৌতুরী—আপনি শুধু কফি খাবেন? একটা লিকয়র—বেনেডিক্টিন্?

—না, ধন্যবাদ।

—বেশ, আচ্ছা, একটা সিগার? হের্ ওবার—

—ধন্যবাদ।

—মেয়েটি গ্রেট্সেন্ নয়, কিন্তু তার মত ঠিক দেখতে। আচ্ছা,

আমার মেয়ে মার্গারেট তা হলে কোথায়—'প্রোজিট' হের্ চৌতুরী—কোথায়, আমরা জানি না, বেশ, একবার তার খবর পাওয়া গিয়েছিল, আবার সে হারিয়ে গেছে, বৃহৎ পৃথিবীর হাজার হাজার মেয়েদের মধ্যে হারিয়ে গেছে—কোনদিন আর তাকে দেখব না—আমি তার পক্ষে মৃত, সে আমার পক্ষে মৃতা—মৃত, হাঁ, আমাদের দু-জনের মধ্যে যুদ্ধে মৃত হাজার হাজার শবদেহের স্তূপের বিরাট ব্যবধান—তা আমি ভুলে গেছলুম—গুট সেয়ার গুট্ হের্ চৌতুরী।

সহসা নয়মান্ মদের গেলাস হাতে দাঁড়িয়ে উঠলেন—হে আমার অজ্ঞাতবাসিনী কন্যা, তোমাকে আমি হয়ত কখনও দেখব না—তুমি—তুমি সুস্থা হও—তুমি সুখী হও—

এক চুমুকে গেলাসের সব মদ খেয়ে চেয়ারে ব'সে তিনি হাঁপাতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে ট্যাক্সি ক'রে তাঁকে বাড়িতে নিয়ে যেতে হ'ল।

পরদিন সকালে নয়মান্ চলে গেলেন। ষ্টেশনে বিদায় নেবার সময় মেয়ের কথা কিছুই বললেন না। ট্রেন ছাড়লে চেঁচিয়ে উঠলেন, গুডবাই লণ্ডন, গুডবাই ইংলণ্ড, আশা করি আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।

সাতদিন পরে। লণ্ডনের শীতের সকাল যেমন কালো তেমনি ঠাণ্ডা, তেমনি বিমর্ষ; টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। ব্রেকফাষ্ট খাওয়া তখনও শেষ হয় নি, সহসা মেরী মেকলে এসে হাজির, কালো গাউন পরা, মুখ মলিন, হাতে একখানা ভিজে সংবাদপত্র। তার বিষণ্ণ রূপ দেখে মন দমে গেল।

—কি খবর মেরী? কোন দুঃসংবাদ?

—তোমার মার্গারেটের খোঁজ পেয়েছি।

আর সে কিছু বলতে পারল না। সেদিনকার টাইম্‌স্‌ সংবাদ-পত্র খুলে প্রথম পৃষ্ঠায় মৃত্যু-সংবাদ স্তম্ভটিতে একটি নাম দেখিয়ে হাতের কাগজটি এগিয়ে দিলে। লেখা রয়েছে—

চেরিংক্রস হাসপাতালে এক অস্ত্রোপচারের পর, সহসা কিন্তু অতি শান্তভাবে, দুই সপ্তাহের রোগভোগে একুশ বৎসর বয়সে মার্গারেট এথেলমান, আমাদের অতি প্রিয় কন্যা—

তারপর কোন্‌ চার্চ্চে কখন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ধর্ম্মানুষ্ঠান হবে, কোন্‌ কবরস্থানে গোর দেওয়া হবে, তা লেখা আছে।

লেখাটা তিনবার পড়লুম, অক্ষরগুলি চোখের ওপর নাচতে লাগল, কাগজটা হাত থেকে মেঝের কার্পেটের ওপর পড়ে গেল; কাঠের পুতুলের মত বসে রইলুম চেয়ারে।

মেরী বললে,—ওঠ ড্রেস ক'রে নাও, সতীশ আর দু-চারজন বন্ধুকে এখানে আসবার জন্যে টেলিফোন করছি, সময় বেশী নেই; ক্রাইষ্ট চার্চ্চ অনেক দূর, বারোটায় সার্ভিস, কিছু ফুল কিনে নিতে হবে।

—হাঁ, ফুল, অনেক ফুল, সে খুব ফুল ভালবাসত; ফক্সগ্লাভ পাওয়া যাবে, ব্লুবেল—

—না, ও-সব ফুল এখন পাওয়া যাবে না, গোলাপ ক্রিসেন-থেমামে ভরে দেব।

গোরস্থান থেকে ফিরে এসে সমাধিক্রিয়ার সব বিবরণ দিয়ে ফ্রাউ নয়মানকে চিঠি লিখলুম, টাইম্‌স্‌ পত্রের পাতাটিও কেটে পাঠালুম।

পর সপ্তাহে তাঁর চিঠি এল। স্বামীকে তাঁর কন্যার মৃত্যুসংবাদ জানিয়েছেন, তাতে তিনি বিশেষ বিচলিত হন নি। বস্তুতঃ, লণ্ডন থেকে ফিরে এসে পর্য্যন্ত তিনি বলেছেন, তাঁর কন্যা মৃতা, তাঁর পক্ষে মৃতা ; তার সম্বন্ধে তিনি আর কোন খবর জানতে চান না। এখন সারাক্ষণ তিনি মদে চুর হয়ে থাকেন।

মাসের পর মাস কেটে গেল। আবার সুন্দর গ্রীষ্মকাল। এবার কন্টিনেণ্টে লম্বা পাড়ি দিলুম, বল্‌কান্‌স্ পর্য্যন্ত। ফেরবার পথে নয়মান্‌-পরিবারের সঙ্গে দেখা ক'রে আসতে বড় ইচ্ছে হল ; বহুদিন তাদের খবর পাইনি।

নুরন্‌বেয়ার্গ থেকে মোটরকারে রোথেনবুর্গে পৌঁছালুম দুপুর-বেলা। হের্‌ নয়মান্‌ আমাকে দেখে আনন্দে লাফিয়ে প্রায় বুকে জড়িয়ে ধরেন—ওয়েলকাম্‌ ব্রাদার চৌতুরী, কি সৌভাগ্য !

সেই প্রাচীন শহর, সেই পুরান হোটেল সোহো, কিন্তু সব কেমন অদ্ভুত অস্বাভাবিক অপরিচিত মনে হল।

খাবারের ঘরে খেতে বসে দেখি, দু-দিকের দুই দেওয়ালে দু'খানি মস্ত ফটো এনলার্জমেণ্ট, সোনার জলের ফ্রেমে বাঁধান,—একটি মৃতাকন্যা মার্গারেটের ছবি, বারো বছরের গ্রেটসেন ; আর একটি ফ্রাউ আমেলিয়া মাগডালেন নয়মানের।

—হের্‌ চৌতুরী, আপনাকে জানান হয়নি, আমার দ্বিতীয়া স্ত্রী গত মার্চ্চ মাসে মারা গেছেন ; এখানকার আবহাওয়া তাঁর সহ্য হচ্ছিল না। আর এক গেলাস বীয়ার হের্‌ চৌতুরী, হাল্কারঙের—

আনা! আনা—এক গেলাস হাল্কারঙের—আচ্ছা আর এক গেলাসও নিয়ে এসো—

ডগডগে লাল ফ্রকের ওপর ছাপান নীল ফুলের সাদা য়্যাপ্রন প'রে এক অতি স্থূলকায়া বেঁটে মধ্যবয়স্কা স্ত্রীলোক পাঁচ আঙুলে দুইটি বীয়ারের গ্লাস নিয়ে আমাদের সামনে এলেন।

—ইনি আমার নতুন স্ত্রী, আনা,—হের্ চৌতুরী আমাদের প্রিয় ভারতীয় বন্ধু, লণ্ডন থেকে আসছেন। একটু বোসো আনা।

আনা কিন্তু বসলেন না। তাঁর অনেক কাজ।

—বুঝলেন কি-না হের্ চৌতুরী, হোটেল চালাতে একজন কর্ত্রী থাকা বিশেষ দরকার, না হলে অতিথিদের ঠিক মত সমাদর করা যায় না।

সন্ধ্যার সময় নয়মানের সঙ্গে বেড়াতে বার হলুম। নগর-পরিখা পার হয়ে সেই কবরস্থান। তেম্‌নি লিলি ক্লোভার ফক্সগ্লাভ, নানা রংএর ফুলের মেলা, তেম্নি সুন্দর নীলাকাশ, গোধূলির রাঙা আলো; বড় করুণ লাগল সব।

দুইটি কবর পাশাপাশি; একটি দ্বিতীয় ফ্রাউ নয়মানের, তার পাশে একটি নকল গোর মার্গারেটের।

নয়মান্ কতকগুলি ফুল তুলে দুই সমান ভাগ ক'রে দুই কবরের ওপর ছাড়িয়ে দিলেন, তারপর ঘাসের ওপর বসে পড়লেন।

—এখানে বসে সূর্য্যাস্ত দেখতে বড় ভাল লাগে। রোজ সন্ধ্যা-বেলায় এখানে এসে বসি।

আমি চুপ করে এক ভাঙা পাথরের ওপর বসলুম।

—আচ্ছা হের্ চৌতুরী, আপনার কি মনে হয়, সে রাতে

রেস্তোরাঁ আর অপেরাতে না গিয়ে আমরা যদি লণ্ডনের সব হাসপাতাল ঘুরে ঘুরে গ্রেটসেনের সন্ধান করতুম, তাহলে হয় ত তার দেখা পেতুম। সে বাঁচত না জানি, তবু তাকে একবার দেখতে পেতুম।

অশ্রুজলে নয়মানের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। চারিদিকে সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে এল। দূরে গির্জ্জার ঘণ্টা বেজে উঠল সন্ধ্যারতির শঙ্খের মত।

—চলুন, দেরী হয়ে যাচ্ছে, টমাস কুকের এক দল ভ্রমণকারী সন্ধ্যার ট্রেনে আসছে।

রাতে ডিনারের পর শহর ঘুরে আবার বাগানে এসে বসলুম। ভেতরে নৃত্যশালা সরগরম। কুক-কোম্পানীর ভ্রমণকারী নর-নারীরদল জীবনের আনন্দ উপভোগ করে নিতে তৃষিত চঞ্চল—ট্যাঙ্গো ফক্সট্রট্ চার্লসষ্টোন—নৃত্যের পর নৃত্য, সুরা পানের পর সুরা পান। মাঝে মাঝে নয়মান্ তাঁর কালো কোটের লেজটা দুলিয়ে বার্লিন বা প্যারিসের কোন নূতন অপেরেটের হাস্যকর আদিরসাত্মক গান গেয়ে সটীক অনুবাদ ক'রে সবার মনোরঞ্জন করছেন। আর তাঁর তৃতীয়া স্ত্রী স্থুলকায়া আনা, কালো ভেলভেটের এক গাউন প'রে পিয়ানো বাজাচ্ছেন অতি প্রাণহীনভাবে।

—এই যে আমার ভারতীয় ব্রাদার, বাইরে ব'সে কেন! আসুন নৃত্যশালাতে, সম্মুখে এমন নৃত্যগীতের আনন্দ-নদী প্রবাহিত, আর আপনি চুপ ক'রে তীরে ব'সে থাকবেন, ঝাঁপিয়ে পড়ুন এ-স্রোতে—

—ধন্যবাদ হের্ নয়মান্, আমি এখানে বেশ আছি।

—বেশ, খুব ভাল, যেমন আপনার খুশী—বীয়ার শাম্পেন্—শুধু কাফি! ভাল, খুব ভাল! এ গানটা শুনেছেন—

I want to be happy but I can't be happy—ha! ha! la la! ha! ha!

তাঁর সে অট্টহাস্য কান্নার চেয়েও করুণ হতাশাময়।

পরদিন প্রভাতে যখন হোটেল সোহো ছেড়ে এলুম হের্ নয়মানের সঙ্গে দেখা হল না, রাত দুটো পর্য্যন্ত নৃত্যগীত চলেছিল, তিনি সকালে শ্রান্ত হয়ে নিদ্রিত।

লতিফের গান

১

ঘ্যাং ঘ্যাং ঘড়্ ঘড়্ কড়্ কড়্ ঘং ঘং—টং !

ছাপিবার কলের গান দীপক-তানে লতিফের কানে বাজিয়া তাহার ঘুম ভাঙাইয়া দিল। যে গলির ছাপাখানায় সে কাজ করে তাহারই সম্মুখের বস্তিতে এক ছোট মাটির ঘরে প্রভাতের আলোয় সে জাগিয়া ময়লা বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিল। ছাপাখানায় কলের গান নয়, কোন্ অজানা কবির গান তাহার প্রাণে উচ্ছ্বসিত, বিছানা তুলিতে তুলিতে হাত-মুখ ধুইয়া চা খাইতে খাইতে বালক-মনের সরল সুখে নূতন দিনের জাগরণের আনন্দে স্বকল্পিত সুরে গুন গুন করিয়া সে গাহিতে লাগিল— 'আলোকের এই ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও।' এই একটি মাত্র লাইনই সে জানে।

গলির মোড়ের ছাপাখানায় যাইলেই দেখিতে পাওয়া যায়, লতিফ ছাপিবার কলের পাশে এক বড় উঁচু টুলে বসিয়া আছে। কলেতে ছাপিবার কাগজগুলি ঠিক করিয়া রাখিয়া দেওয়া তাহার কাজ। পরণে, লাল-নীল চেক-কাটা এক ময়লা লুঙ্গি, গায়ে প্রায় কিছুই থাকে না, কখনও লাল কি নীল রঙীন গেঞ্জি গায়ে ওঠে ; কিন্তু সেটা শীঘ্রই ছাপাখানার কালিতে চিত্রিত হইয়া যায় ; কচি বাঁশের মত সুকুমার মুখখানি সুন্দর নয় বটে কিন্তু কি করুণ মধুর

আভা-মাখান, নাকটা একটু থ্যাবড়া, ঠোঁট মোটা, হলদে ময়লা কয়েকটা দাঁত উঁচু হইয়া বাহির হইয়া আছে, গালে কয়েকটি কাল দাগ, তাহার সঙ্গে ছাপার কালির দাগও আছে, উস্ক-খুস্ক চুলগুলি কখনও মুখের উপর ঝুলিয়া পড়ে, কখনও চারিদিকে ছড়াইয়া থাকে। কিন্তু তাহার চোখ-দুটি অতি সুন্দর, চোখে সব সময়ই একটু উদাস শান্ত দৃষ্টি, চোখের মধুর আলো সমস্ত মুখে স্নিগ্ধ আনন্দের আভা মাখাইয়া দিয়াছে, শুধু মাঝে মাঝে চোখে একটা শঙ্কিত উদাস ভাব জাগিয়া উঠে, মুখখানি ক্ষুব্ধ ব্যথিত হয়। তাহার হাত আঙ্গুলগুলি বেশ পরিষ্কার কিন্তু সমস্ত দেহ ময়লার ভরা, ছাপার কলের মতন কালো।

কলটা যখন চলে, সে টুলটায় উবু হইয়া বসিয়া এক একখানি কাগজ ঠিক রোলারের মুখে বসাইয়া দেয়, তখন চোখে সজাগ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি জাগিয়া উঠে, মুখখানিতে একটু শঙ্কিত ভাবের ছায়া পড়ে, কনুইয়ে গাল রাখিয়া স্থির নেত্রে সে কাগজ সাজাইয়া কলের মুখে চাহিয়া থাকে। তার মুখখানি একটু কুঞ্চিত হয়, যেন সে শিষ দিতেছে, কিন্তু সে স্তব্ধ হইয়া থাকে। এই বৃহৎ কালো কলের পাশে কলেরই মতন কালো ছোট ছেলেটিকে কলেরই একটা অংশ বলিয়া মনে হয়, কলটি যে ছন্দে কাগজের পর কাগজ টানিয়া গোল করিয়া গুটাইয়া ছাপাইয়া আবার খুলিয়া অপরদিকে সাজাইয়া রাখিতেছে, সেই ছন্দেই লতিফের হাত কাগজের পর কাগজ কলের মুখে জোগাইতেছে, তাহার ওই হাতখানি যেন কলেরই একটা অঙ্গ। কিন্তু মাঝে মাঝে যখন কলের এক-টানা ঘড় ঘড় শব্দের সুর শুনিয়া অবিশ্রান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া পড়ে, তাহার সুকুমার অন্তরের নীড়ে

ঘুমন্ত কোন গানের পাখী বিদ্রোহী হইয়া জাগিয়া উঠে, তখন সে কলের গানের সহিত পাল্লা দিয়া মাথা দোলাইয়া শিষ দিয়া আপন মনে গান গায়, তাহাকে আর তখন কলের অঙ্গ বলিয়া মনে হয় না।

আর যখন কল চলে না, সে কখনও টুলে বসিয়া কলে মাথা রাখিয়া ঘুমায়, কখনও বা কলে ঠেস দিয়া পা দোলাইতে দোলাইতে প্রুফের কোনও ছেঁড়া অংশ, কোনও ছাপা কাগজের টুকরা, নূতন-ছাপান ফর্ম্মার বাতিল কাগজ তুলিয়া লইয়া পড়ে, কবিতা বা গান হইলে বসিয়া বসিয়া মুখস্থ করে, গানটা ভাল লাগিলে কাগজের টুকরা-টুকু ঘরে লইয়া যায়। এ গান কে লিখিয়াছে তাহা সে জানে না, গানের কি সুর তাহা শোনে নাই, আপন মনে একটা সুর ঠিক করিয়া গানটি গাহিয়া মুখস্থ করে; সব সময়ে কবিতা বা গানের অর্থও বোঝে না, মনে মনে একটা ভাল অর্থ ঠিক করিয়া লয়। কখনও বা পদ্য বা গদ্যের কোনও লাইন পড়িতে বেশ ভাল লাগিলে নিজে সুর বসাইয়া সে গান করিয়া বাঁধিয়া লয়।

চা খাওয়া শেষ করিয়া লতিফ তাহার মাথার গোড়ায় কুলুঙ্গি হইতে একখানা খাতা পাড়িল, তাহার মধ্য হইতে দুই টুকরা কাগজ বাছিয়া বাহির করিল, এই দুই কাগজখণ্ড কাল সে ছাপা-খানা হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে, একটিতে একটি গানের অংশ আর একটিতে এক কবিতা ছাপা। এই দুইটি আজ তাহাকে মুখস্থ করিতে হইবে।

গানটি গাহিতে গাহিতে সে বস্তির পঙ্কিল দুর্গন্ধময় পথ দিয়া তাহার ছাপাখানার দিকে চলিল—

তোমার আলো ভালোবেসে পড়েছে মোর গায়ে এসে

২

প্রভাতের আলোয় চারিদিক্ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু বস্তির শেষে হল্‌দে পুরানো বাড়ীখানি অন্ধকার নিঝুম। পথের ধারের দোতলার ঘরখানির সব জানালা বন্ধ, অন্ধকার কোণে বাড়ীর যুবতী বধূ মেঝেতে লুটাইয়া পড়িয়া আছে। খড়খড়ির ফাঁক দিয়া আলোর ক্ষীণ রেখাগুলি ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, এ আলো তাহার ভাল লাগিতেছিল না। প্রভাত ত তাহার কাছে প্রভাত নয়, অন্ধকার রাত্রি তাহারই মত শোকাতুরা একাকিনী বিষাদিনী ছিল, তাহার তারায় তারায় অন্তরের নির্ব্বাক্ বহ্নির মত স্তব্ধ অন্ধকারে অশ্রুজল, সে-রাত্রির প্রহরগুলি অশ্রুতে ভরিয়া ভরিয়া সে একটু শান্ত হইয়াছিল, কিন্তু এ প্রভাতের দণ্ডগুলি আলোকে মাতাল ভ্রমরদলের মত উতলা হইয়া উঠিয়াছে, এ আলোর রেখাগুলি—যেন কে শুভ্র দন্ত মেলিয়া ব্যঙ্গ হাসি হাসিতেছে! আর সে সহিতে পারে না। আর জীবনের ভার বহিতে পারে না। ভাবিয়া ভাবিয়া সে দিশাহারা হইয়াছে।

এ চির-দুঃখের পৃথিবীতে জন্ম হইতে সে অনেক সহিয়াছে। ছেলেবেলায় সে বাবা-মাকে হারাইয়াছে, ধনী কাকার গৃহে অনাদরে অবজ্ঞার ঝির মত সংসারের কাজ করিয়া মানুষ হইয়াছে, কোনও দিন ভাল খাইতে পায় নাই, পরিতে পায় নাই। তাহার যখন বিবাহের বয়স হইল, তাহার রূপ নাই বলিয়া কেহ পছন্দ করে না এজন্য কত বিদ্রূপ শুনিয়াছে, তারপর এক দ্বিতীয় পক্ষের বরের

সহিত বিবাহ হইল। স্বামীর ঘর করিতে আসিয়া শাশুড়ীর নিকট প্রতিদিন কত লাঞ্ছনা, অপমান, কটু কথা,—তাহার স্বামী মাতাল, সে তাহারই দোষ, সে কেন স্বামীকে শাসন করিয়া সৎপথে রাখিতে পারে না; তাহার স্বামী লম্পট, গণিকালয়ে যায়, সেও তাহারই দোষ, সে কেন স্বামীর মন ভুলাইয়া ঘরে রাখিতে পারে না; তাহার স্বামী কত খেয়ালে চলিতেছে, বিষয় উড়াইয়া দিতেছে, সব তাহারই দোষ, সে কেন জোর করিয়া স্বামীকে ধরিয়া পায়ে লুটাইয়া কাঁদিয়া সাধিয়া ভাল করে না; তাহার যে এক মৃত সন্তান হইয়াছিল, সে তাহারই দোষ, তারপর যে আর তাহার কোনও সন্তান জন্মায় নাই, তাহাও তাহারই দোষ—শাশুড়ীর সব ভৎর্সনা গঞ্জনা সে নত-মুখে সহিয়াছে।

কিন্তু গত সন্ধ্যায় যখন সে শুনিল, নোট জাল করার অপরাধে তাহার স্বামীকে পুলিশে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, অনেক বছর জেল হইবে, সে আর সহিতে পারিল না, মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। যখন মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল, শাশুড়ীর তীব্র ব্যঙ্গ কঠোর ভৎর্সনা তাহার কাণে আসিয়া লাগিল—সে ঢং করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছে, তাহার শোক লোক-দেখানো ঠাট, সে এই বাড়ীর অলক্ষ্মী!

আর সে সহিতে পারে না। তাহার স্বামী জালিয়াৎ, তাহার স্বামী জেলের কয়েদী! স্বামীকে সে মনপ্রাণ দিয়া সেবা করিয়াছে কিন্তু তাহার ভালবাসা কোনও দিন পায় নাই।

এ ব্যর্থ জীবন শেষ হইয়া যাক, মৃত্যুর স্তব্ধ শীতল অন্ধকারে সকল জ্বালা সকল কান্না নিমেষে শেষ হইয়া তলাইয়া যাক।

উন্মত্তার মত উঠিয়া নির্য্যাতন-ক্ষুব্ধা নারী দেরাজ হইতে বিষের

শিশি বাহির করিল। লুব্ধ হিংস্র চোখে শিশিটির দিকে চাহিয়া রহিল। এই রাঙা টলটলে তরল পদার্থটুকু চোখ বুজিয়া গলায় ঢালিয়া দিবে—গলা হয়ত একটু জ্বলিবে, বুক হয়ত একটু বেদনায় কাঁপিবে, একটু হয়ত ব্যথায় ছটফট করিবে কিন্তু তার পর ত চিরশান্তি, অনন্ত আরাম! আর ভাবিতে হইবে না, কিছু সহিতে হইবে না।

মোহাবিষ্টের মত শিশিটা নাড়িয়া সে একটু দেখিতে লাগিল। শিশিটির দিকে চাহিয়া চাহিয়াই তাহার মন কিছু শান্ত হইয়া গেল।

সহসা সে চমকিয়া উঠিল—

'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে!' ও কার কচি মিষ্ট গলা? ও কি মধুর করুণ সুর! কে পথ দিয়া গাহিয়া যাইতেছে—'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।' কে এমন অদ্ভুত কথা বলিতেছে, এ চির-দুঃখের পৃথিবীতে কে মরিতে চায় না? একবার সে তাহাকে দেখিতে চায়, তাহার সহিত মুখোমুখি দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিতে চায়, সত্যই কি মরিতে চাও না? বল, বল, মন খুলিয়া বল, সত্যই তুমি বাঁচিতে চাও? এ ভুবন সত্যই সুন্দর?

জানালার ওপর ছুটিয়া পড়িয়া সশব্দে জানালা খুলিয়া এ বন্দিনী বধূ পথের দিকে চাহিল। একটি মুসলমান ছেলে মাথা নাড়িতে নাড়িতে মাঝে মাঝে আঙ্গুলে তুড়ি দিতে দিতে গান গাহিয়া চলিয়াছে—'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।' পূর্ব্বদিকে দিগন্তে আকাশের পেয়ালা উপছাইয়া রাঙা আলো দিকে দিকে

ছড়াইয়া পড়িতেছে। এই স্নিগ্ধোজ্জ্বল নির্ম্মল আলোর স্পর্শে অন্ধকারের দুঃস্বপ্ন যেন দূর হইয়া গেল। শিশির রাঙা বিষে তাহার মন যে মোহাচ্ছন্ন হইয়াছিল, এ রঙীন আলোর মায়া সে মোহ দূর করিয়া তাহার চারিদিকে কি সৌন্দর্য্য-জাল রচনা করিল! এ সুন্দর সোনার প্রভাতে সে মরিবে না, সে বাঁচিতে চায়! শিশিটা সে পথে ফেলিয়া দিল।

সেই মুসলমান ছেলেটি আনন্দদীপ্ত চোখে জানলার দিকে চাহিল, তাহাকে দেখিয়া কি সুন্দর হাসি হাসিয়া, গান গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল।

এই হতভাগিনী অপমানিতা নারী মরিতে চায় বটে কিন্তু তাহার গর্ভে যে অজাত-শিশু রহিয়াছে, সে বাঁচিতে চায়, সে এই সুন্দরী পৃথিবীর কোলে জন্মাইয়া সুখ-দুঃখের দোলায় দুলিতে চায়। সেই অজাত-শিশুর জীবনের তৃষ্ণায় ভাবী মাতা চঞ্চল হইয়া উঠিল। না, সে মরিবে না, সেই শিশুর আনন্দ-তৃষ্ণা মিটাইবার জন্য মাতা সকল দুঃখ সকল অপমান সহ্য করিবে।

প্রভাতের রাঙা আলোর দিকে নীরবে মাথা নত করিয়া সে দুঃখের নবজীবনকে বরণ করিয়া লইল।

৩

সন্ধ্যার উদাস আলোর দিকে উদাস নয়নে চাহিয়া যুবকটি ভাবিতেছিল—

নারী! কে তাহাকে বুঝিতে পারিয়াছে? এ চির-রহস্যময়ী মায়াবিনীর অবগুণ্ঠন খুলিয়া কে তাহার সত্য রূপ দেখিয়াছে?

সে আর দেখিতে চায় না, সে বুঝিতে চায় না, সে নারীর বিষয় ভাবিতে চায় না, নারীর সহিত সব সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে চায়।

ওরা ভুলায়, মাতায়, খেলায়, ধরা দেয় না।

যে মেয়েটিকে সে ভালবাসিয়াছে, সে এখন আর তাহাকে ভালবাসে না, এই কি তাহার ব্যথা? না, সে মেয়েটি এতদিন তাহার সহিত প্রেমের ভণ্ডামি করিয়াছে, সে মেয়েটি তাহাকে সত্যই কোনও দিন ভালবাসিত না, কিন্তু কত আভাসে ইসারায় তাহার চোখের চাওয়ায় প্রেমের লীলায় সে দেখাইয়াছে সে তাহাকে ভালবাসে। সে হয় ত এ তরুণীর ভালবাসা বিশ্বাস করিত। কিন্তু সেদিন সে তাহার বিখ্যাত গায়ক বন্ধুটির সহিত মেয়েটির আলাপ করিয়া দিল, বন্ধুর গানে মেয়েটি বিমুগ্ধা হইয়া গেল, তাহার ব্যবহার একেবারে বদ্‌লাইয়া গেল। ধরা পড়িয়া গেল—মেয়েটি তাহাকে ভালবাসে নাই। ও, ফ্লার্ট্‌!

যুবকটি টেবিল হইতে একখানি চিঠি তুলিয়া মুঠায় পূরিয়া পাকাইতে লাগিল। মেয়েটির চিঠি, লিখিয়াছে, সে কেন দু'দিন

আসে নাই, তাহার কি অসুখ করিয়াছে, সে কি রাগ করিয়াছে ? সে যেন সন্ধ্যায় নিশ্চয় আসে।

না, সে সন্ধ্যায় যাইবে না।

আচ্ছা, সে যাইবে। সে মুখের উপর শুনাইয়া আসিবে, সে মেয়েটির সম্বন্ধে কি ভাবে—সে ফ্লার্ট্, সে ভণ্ড !

ও কি !

যাব না গো অমনি চলে
মালা তোমার দেব গলে—

যুবকটি চমকিয়া লাফাইয়া উঠিল। কে পথ দিয়া গান গাহিয়া যাইতেছে, কি করুণ মধুর সুর! ও, ওই প্রেসের মুসলমান ছেলেটা ; সারাদিনের কাজ শেষ করিয়া ছেলেটি বাড়ী চলিয়াছে, তাহার হাতে একটুক্‌রা কাগজ, সেই কাগজটা মাঝে মাঝে দেখিতে দেখিতে ছেলেটি মনের আনন্দে গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে। সে এমন অদ্ভুত ভুল সুরে গানটি গাহিয়া চলিয়াছে যে তাহার গান শুনিয়া যুবকটির হাসি আসিল। ছাপিবার কলের ঘড়্ ঘড়্ শব্দের সহিত তাল রাখিয়া হাল্কা নাচুনীর সুর তৈরী করিয়া সে গান গাহিয়া চলিয়াছে। কিন্তু ছেলেটি গানের আনন্দে কি রকম মশ্‌গুল হইয়া চলিয়াছে, তাহা দেখিয়া যুবকটি বিস্মিত মুগ্ধ হইল। এ সরল মনের আনন্দের স্পর্শ তাহার ব্যথিত হৃদয়ে আসিয়া লাগিল। সে শিহরিয়া উঠিল।

হাঁ, এই ত তাহার মর্ম্মের ব্যথা, তাহার গোপন বাণী, তাহার স্বপ্ন, সে ত মেয়েটিকে এই কথাই বলিতে চায়।

পাকানো চিঠিখানি ভাল করিয়া খুলিয়া সন্ধ্যার ম্লান আলোয়

অনেকক্ষণ ধরিয়া সে বার বার পড়িল। সে ভুল পড়িয়াছিল, এ চিঠিখানি সে ভুল বুঝিয়াছিল। এ চিঠি নিংড়াইলে যে অশ্রুজল ঝরে, এর পাতায় পাতায় বিরহ-বেদনা, উৎকণ্ঠাময় প্রতীক্ষা।

হায়, সে ভুল ভাবিয়াছে, ভুল দেখিয়াছে। এ সন্ধ্যার অন্ধকারে যেমন সব জিনিষ অস্পষ্ট বৃহৎ দীর্ঘছায়াঘন দেখায়, তেমনই ঈর্ষ্যার বেদনাময় অন্ধকারে সে সমস্ত কথা ব্যবহার বিকৃত বৃহৎ করিয়া দেখিয়াছে। মেয়েটি যখন গায়ক-বন্ধুর প্রতি চাহিয়া একটু হাসিয়াছে, সে ভাবিয়াছে মেয়েটি তাহাকে বিমুগ্ধ করিতে চায়, মেয়েটি একটু অন্তরালে দাঁড়াইয়া দু'চারটি সামান্য কথা কহিয়াছে, সে ভাবিয়াছে প্রেমালাপ হইতেছে।

তরুণী ফ্লার্ট্ নয়, সে সত্যই প্রেমিকা, তাহার চারিদিকে কত স্বপ্ন কত আশা কত ইসারা কত স্মৃতি, তাহার সঙ্গে কত প্রভাতের সূর্য্যালোক কত রাত্রির জোৎস্না-ধারা জড়ান; কখনও অলসমধুর মধ্যাহ্ন-অবসরে মৃদুগল্প-গুঞ্জরণ, কখনও রঙীন সন্ধ্যায় রজনীগন্ধা হাস্নাহানার গন্ধ, কখনও তারা-ভরা আকাশের তলে সুরের উৎসব, কত সাহানা কত বাগেশ্রী,—এ তরুণী কত আনন্দ-ক্ষণের স্মৃতিপুষ্প দিয়া গাঁথা মালা।

ব্যথায় যুবকের চোখ জলে ভরিয়া গেল! তারপর জলে-ধোওয়া চোখে বৃষ্টিশেষে ইন্দ্র-ধনুর মত তরুণীর অপরূপ রূপ ভাসিয়া উঠিল।

আজ সে তাহার কাছে যাইবে, ক্ষমা করিতে নয়, ক্ষমা চাহিতে।

সেই মুসলমান ছেলেটির গান মনের ঘরে ঘরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাজিতে লাগিল—

যাব না গো অমনি চ'লে
মালা তোমার দেব গলে—

ধীরে সে চিঠিখানিকে চুম্বন করিল।

৪

জমাট চোখের জলের মত একটু জ্যোৎস্না জানালার ফাঁক দিয়া বিছানায় আসিয়া পড়িয়াছে। মৃত্যুপথ-যাত্রী বৃদ্ধ কবি এ জ্যোৎস্না-লেখার দিকে সজল নয়নে চাহিয়া শুইয়াছিল।

মৃত্যুদূত আজ তাহার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এ জীবনের নদী পার করিয়া কোন্ নবলোকে লইয়া যাইবে, সেজন্য তাহার কোনও ভয় নাই; যাত্রীপ্রাণ নবলোকে যাইবার জন্য তৃষিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু পাথেয় কৈ? তাহার ভাণ্ডার শূন্য, তাহার জীবন যে ব্যর্থ, এ পৃথিবীর রূপপুরীতে বিশ্ব-কবি যে তাহার হাতে বাঁশী দিয়া পাঠাইয়াছিলেন, সে কি গান গাহিয়াছে? কত সন্ধ্যা কত প্রভাতের সোনার আলো, কত শরৎ কত বসন্তের জ্যোৎস্না-ধারা এ জীবন-পাত্রে ঝরিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে যে গানের ফুল ফুটিয়াছিল, যে সুরের কুঁড়ি জাগিয়াছিল, তাহার ত কিছুই নাই, কবে সব ঝরিয়া পড়িয়াছে, শূন্যে মিলাইয়া গিয়াছে! হায়, আজ মৃত্যুর হাতে জীবনের শূন্য পাত্রখানি সে কি করিয়া দিবে? ব্যর্থ, ব্যর্থ, সে।

'একদা তুমি প্রিয়ে
আমার এ তরুমূলে
বসেছ ফুল-সাজে
সে কথা কি গেছ ভুলে?'

কে গায়? পথ দিয়া কে গান গাহিয়া যায়। গানের ছোঁয়ায় রুগ্ন বৃদ্ধ বিছানায় উঠিয়া বসিল, জানালাটা খুলিয়া দেখিল, কচি বাঁশের বাঁশীর মত একটি মুসলমান ছেলে মাথা দোলাইয়া গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে।

এ সুন্দর জ্যোৎস্না-রাত্রির দিকে চাহিয়া বৃদ্ধ কবি বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিল না, বিছানায় শুইয়া পড়িল, তাহার সমস্ত দেহে চাঁদের আলো ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

না প্রিয়া ভোলে নাই, তাহার জীবন-তরুর মূলে যে কলা-লক্ষ্মী জ্যোৎস্না-রাতে বীণার ঝঙ্কার তুলিয়াছে, সেই কবিতা-রূপিণী প্রিয়া একবার মূর্ত্তিমতী হইয়া আসে না, মানস-সরোবরের সকল গানের পদ্মের মালা যে তাহার গলায় দোলান, সেই মালাটি সে মৃত্যুর হাতে দিয়া সকল লজ্জা দূর করে না?

আজ তাহার জীর্ণ দেহ, নিষ্প্রভ নয়ন, ভগ্ন কণ্ঠ, কিন্তু একদিন সে ত প্রিয়াকে ফুলসাজে সাজাইয়াছে, সেই ফুলের গন্ধে আজ যাত্রার রাত্রির দণ্ড প্রহর উতলা হইয়া উঠিয়াছে। সে ব্যর্থ নয়। কত শরৎ প্রভাত, কত মাধবী রাত্রির কণ্ঠে সে যে সুরের মালা দোলাইয়া দিয়াছে, সে-সব মালা কবে ছিঁড়িয়া খসিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার প্রিয়া এ মালাগুলির কথা ভোলে নাই—সেই হারাইয়া-যাওয়া ভুলিয়া-যাওয়া মালাগুলি মৃত্যু-বধূর গলায় দোলাইয়া তাহার

হাত ধরিয়া সে নব-জীবনের অভিসারে নির্ভয়ে আনন্দে চলিয়া যাইবে।

নীলাম্বরী সুন্দরী শ্যামা ধরণীর দিকে চাহিয়া বৃদ্ধ কবি জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, সে ধন্য হইয়াছে!

রাত্রি গভীর হইয়াছে, চারিদিক নিঝুম, চাঁদের আলোয় সেই কদর্য্য বীভৎস বস্তিটিও এক মায়াপুরীর মত দেখাইতেছে। বস্তির কোণে ছোট মাটির ঘরে ক্ষীণ প্রদীপের আলোয় লতিফ এক গাদা কাগজের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, আজ সে ছাপাখানা হইতে অনেকগুলি টুকরা কাগজ আনিয়াছে, সেগুলি সে বাছিয়া বাছিয়া পড়িতেছিল, যে লাইনগুলি ভাল লাগিতেছিল, সেগুলি তাহার এক মোটা খাতায় গুণ গুণ করিয়া গান করিতে করিতে টুকিতেছিল। এ খাতাখানি ছাপাখানার দপ্তরী তাহাকে উপহার দিয়াছে।

লেখা শেষ হইল, সে প্রদীপ নিভাইয়া দিল, ছোট জানালা দিয়া একটু জ্যোৎস্না তাহার গায়ে আসিয়া পড়িল। ধীরে উঠিয়া জানালা দিয়া আকাশের দিকে চাহিল। জ্যোৎস্না-ধোওয়া এক টুক্‌রা নীলাকাশ নীলকান্তমণির মত জ্বল্‌জ্বল্‌ করিতেছে। তাহার দেহ-মন কি এক অজানা আনন্দে ভরিয়া উঠিল।

জানলাটা ভাল করিয়া খুলিয়া দিয়া ধীরে সে তার মলিন বিছানায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে সে ছাপিবার কলের ঝঙ্কার শুনিয়া চমকিয়া উঠিতে লাগিল—

ঘ্যাং ঘ্যাং ঘড়্‌ ঘড়্‌ ঘর্‌ ঘর্‌ ঘং ঘং—টং।

ফাঁকি

১

দাদামশাই !

এখনও ঘুমোস্ নি সুধা, কি কষ্ট হচ্ছে মা ?

না, দাদামশাই কোন কষ্ট নয়, তুমি এবার ঘুমোতে যাও, কোন দরকার হ'লে ডাক্‌বো'খন।

সে ঘুমের ওষুধটা—

না, দাদামশাই, ওষুধ খেলেও আমার ঘুম হবেনা, তার চেয়ে তুমি একটু গল্প করো, আমি গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি।

মাতৃহারা ক্ষুদ্র বালিকা সুধাকে কত রাত কত গল্প বলিয়া দাদামশাই ঘুম পাড়াইয়াছেন, কিন্তু আজ এ মৃত্যুপথযাত্রিণী যক্ষ্মা-রোগাক্রান্তা নারীকে তিনি কি গল্প বলিয়া ভুলাইয়া ঘুম পাড়াইবেন ! তাঁহার হৃদয় কত সুখ-দুঃখের স্মৃতিতে ভারী হইয়া চোখ দুইটি জলে ভরিয়া আসিল, ভাঙা গলায় তিনি বলিলেন, দেখ সুধা—তারপর আর কিছু বলিতে পারিলেন না, শুধু দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া বেদনায় স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। অদূরে সমুদ্রের একটানা করুণ কল্লোলধ্বনি তাঁহার ভগ্ন জীবনের দীর্ঘ হতাশ্বাসের মত কাণে আসিয়া বাজিতে লাগিল, বাহিরে মৃদু জ্যোৎস্না থম্ থম্ করিতে লাগিল।

ঘরের অন্ধকারময় স্তব্ধতা পাষাণভারের মত দাদামশায়ের বুকে যেন চাপিয়া ধরিল, তিনি ধীরে ধীরে পাশের ঘরে গিয়া বসিলেন, সুধা, এখন একটু বেদানার রস খাবে ?

আচ্ছা দাও দাদু,—কটা বেজেছে এখন ?—

এখন প্রায় দশটা।

মোটে দশটা ? আমার মনে হচ্ছে যেন কত রাত হয়েছে, যেন এ রাতের আদি নেই—শেষও হবেনা—হ্যাঁ, দাদামশাই, আলোটা এ ঘরে নিয়ে এস, ওই কোণে রাখ,—

চোখে লাগ্‌বে যে—

না, লাগবে না, বাইরে বড় জ্যোৎস্না, চোখ দুটো যেন জ্বালা করছে, ঘরে আলো থাকলে বাইরেটা তবু অন্ধকার হবে—

দাদামশাই আলোটা মাথার দিকে জান্‌লার পাশে রাখিলেন। তারা-ভরা আলোছায়াময়ী রাত্রি এতক্ষণ মৃত্যুর মত স্তব্ধ রহস্যময় নিঃশব্দ-চরণে শিয়রে দাঁড়াইয়াছিল, ঘরে আলো আসাতে ঘর হইতে একটু সরিয়া দাঁড়াইল।

বেদনার রস খাইয়া সুধা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দেওয়ালে ঘরের নানা জিনিষের অদ্ভুত ছায়াগুলি দেখিতে লাগিল। দাদামশাই ভাবিলেন, সুধার এবার ঘুম আসিতেছে।

সহসা সে বলিয়া উঠিল—আচ্ছা দাদামশাই তুমি কি দুপুরে ওঁর চিঠিটা পড়ে' শুনিয়েছিলে ?—আমার ঠিক মনে পড়ছে না—

চিঠির কথা হইতেই দাদামশায়ের বুকের পাঁজর যেন অসহনীয় বেদনায় কাঁপিয়া উঠিল, আপনাকে দমন করিয়া তিনি বলিলেন—হাঁ, তোমাকে ত বল্‌লুম—

হ্যাঁ, ঠিকই ত তুমি বল্‌লে, উনি এক জরুরী মোকদ্দমায় ব্যস্ত, শেষ হলেই আসবেন। দেখ, আমার সব এলোমেলো হয়ে যায়,

আমি বল্‌ছিলুম কি, ওঁর যদি বিশেষ কাজ থাকে উনি এখন নাইবা এলেন, আমি ত একটু সেরে উঠেছি—

না, আমি চিঠি লিখে দিয়েছি শীগ্‌গীর আস্‌তে, এ বুড়ো কি তোর সেবা করতে পার্‌বে, নাত্‌জামাইয়ের সেবায় দুদিনেই সেরে উঠবি—শেষের কথাগুলি হাসির সুরে বলিলেন বটে, কিন্তু কথাগুলি ব্যঙ্গের মত শোনাইল, শ্লেষ বাক্যগুলিতে নিজেই মর্ম্মাহত হইয়া স্তব্ধ হইলেন।

কিন্তু কথাগুলি সুধার বুকে বিশেষ আঘাত করিল না, তাহার হৃদয় যেন অসাড় হইয়া গিয়াছে, বাইরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া সে ধীরে বলিল—আমি বলছিলুম কি দাদু, খোকাকে শুধু যদি পাঠিয়ে দিতে পারে, একদিনের জন্য, কতদিন আমি তাকে দেখিনি, মনে হচ্ছে যেন কত বছর, কতদিন হবে?

প্রায় একমাস হবে—

একমাস—আচ্ছা ঠাকুরপো'র এখন ছুটি; ওরা যদি খোকাকে একবার পাঠায়, দু'দিনের বেশী আমি তা'কে রাখবনা—আমি শুধু একবার দেখব—আচ্ছা দাদামশাই, খোকা এখানে এলে তার কি কোন ভয় আছে, তা যদি থাকে—

না, মা, সে আমি ঠিক ব্যবস্থা ক'রব—

আচ্ছা, আমি কোলে নিতে পারব ত তাকে?

কোন ভয় নেই, তোমার খোকা তোমার কাছে এলে তার কোন রোগ হবেনা—

তুমি কাল ডাক্তারবাবুকে একবার জিজ্ঞেস কোরো—ওরা কবে আসবে লিখছে,—কাল?

দু'একদিন দেরী হবে, মকদ্দমাটা শেষ না হলে—

হ্যাঁ, ঠিক, মকদ্দমার কথাটা আমি ভুলি গেছলুম,—আচ্ছা, ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস কোরো আমি এখন একটু বেড়াতে পারি কিনা, তা হ'লে কাল সকালে কতকগুলো ঝিনুক কুড়িয়ে নিয়ে আসি—

সে আমি নিয়ে আস্‌ব'খন।

না, তোমার কষ্ট হবে, খোকা ঝিনুক পেলে নিশ্চয় খুব খুসি হবে, আর সেই মুচিটাকে একবার আসতে বোলোত—হরিণের চামড়ার কি সুন্দর জুতো নিয়ে এসেছিল, খোকার পায়ে বেশ মানাবে নয় দাদামশাই ?—

হ্যাঁ, বেশ মানাবে।

আচ্ছা, চিঠিটা কি তোমার কাছে আছে ?

আর এখন চিঠি শোনেনা মা, তা হ'লে রাতে একেবারে ঘুম হবেনা—

এ ক'রাত আমার একটুও ঘুম হয়নি, জান, একটু ঢুল আসে হঠাৎ চমকে উঠি, মনে হয় যেন খোকার পায়ের মিষ্টি শব্দ—কিন্তু চোখ চাইলেই কোথায় মিলিয়ে যায়—আচ্ছা ও ত সমুদ্রের ডাক—

না, বাতাসে ঝাউ গাছগুলোর শব্দ হচ্ছে।

ও, মাঝে মাঝে মনে হয় যেন গাড়ীর শব্দ শুন্‌ছি, যেন গাড়ী করে আমার খোকা আসছে ; সব এমনি গুলিয়ে যায়। দাদামশাই !

কি মা !

সেই চিঠিটা একবার,—না, তোমার পড়তে হবেনা, আমায় শুধু দাও আমি হাতে করে'—

সেটা কোথায় যেন রাখলুম মনে পড়ছে না ত, দেখি বোধ হয় ও ঘরে—

দাদামশাই আলো লইয়া পাশের ঘরে গেলেন, এবং আলোটি সে ঘরে রাখিয়া দিয়া যেন কোন অজানা অন্ধকার পথে একা দিশাহারা হইয়া অসাড়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সুধার সকরুণ জীবনের মত চিঠিটাও একটা মস্ত ফাঁকি। প্রায় একমাস হইল দাদামশাই সুধাকে তাহার মাতাল স্বামীর ঘর হইতে জোর করিয়া লইয়া আসিয়াছেন, এই একমাসের মধ্যে সুধার স্বামীর কোন চিঠিই আসে নাই। দাদামশাই যখন সুধাকে লইয়া আসেন তখন স্বামী কিছু আপত্তি করিলেও শাশুড়ী বিশেষ কিছু আপত্তি করিলেন না। সুধা যখন সুস্থ, সবল ছিল তখন তাহাকে দিয়া সংসারের সমস্ত কাজ করাইয়া লওয়া চলিত, কিন্তু এখন এ রুগ্না, অকর্ম্মণ্যার জন্য শুধু ঝির খরচ নয়, ডাক্তারের খরচও বাড়িয়াছে, একটা যন্ত্র ভাঙ্গিয়া গেলে যেমন সেটাকে দূর করিয়া লোকে নূতন যন্ত্রের অর্ডার দেয়, সুধার শাশুড়ী তেমনি সুধাকে বিদায় দিয়া, তাহার এক নূতন কর্ম্মপরায়ণা বধূর দরকার একথা ঘটকীমহলে জানাইয়া দিলেন। তবে দাদামশাইয়ের আদিক্ষেতা বা দরদটা যে তিনি পছন্দ করিলেন না তাহা লোকসমাজে জানাইবার জন্য তিনি সুধার চারবছরের খোকাকে নিজের কাছে আটকাইয়া রাখিলেন, বলিলেন—তোমাদের মেয়ে তোমরা নিয়ে যেতে পার, আমার নাতিকে আমি দেবোনা। অপ্রেম অনাদর নির্য্যাতনের মধ্যে স্বামীর ঘরে সুধা এই খোকাকে বুকে করিয়া সকল দুঃখ সহজে বহিয়াছে,

খোকাকে আবার দেখিতে পাইবে এই ভাবিয়া তাহার মন দুলিতেছিল।

দাদামশাই সুধার স্বামাকে আসিবার জন্য কয়েকখানা চিঠি লিখিয়াছিলেন, কিন্তু কোন উত্তরই পান নাই, শুধু মাঝে স্বামী কিছু টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিল, আর মণিঅর্ডার কুপনে দু'লাইন লেখা ছিল, এখন আদালতে বড় বেশী কাজ, মক্কেলরা কিছুতেই ছাড়ে না, যাবার সময় নেই, বারবার চিঠি লিখে বিরক্ত করবেন না।

দাদামশাই! খুঁজে পাচ্ছনা বুঝি, আচ্ছা থাক—

এই যে মা—

আচ্ছা কাল দিও, আমি কি ভাবছিলুম জান?

কি রে?—

কি আশ্চয্যি আমার এতদিন কখনও মনে হয়নি—

কি মা?

আচ্ছা দাদু, মার মুখ তোমার মনে আছে ত?

তোর মা!

মার সত্যিকার মুখ আমার খুব অস্পষ্ট মনে আছে, তবে সেই যে ফটোটা আছে—দেখ দাদু খোকার মুখ ঠিক মায়ের মুখের মত হয়েছে, চোখ দু'টোও ঠিক সেইরকম টানা টানা—আমি কি করে' বুঝলুম জান, আমার মনে হ'ল, মা যেন ওই জানলার কোণ থেকে আমার দিকে চেয়ে আছেন, ঠিক তাঁর মত একখানা মুখ—হঠাৎ সে মুখ মিলিয়ে গেল, আবার ভেসে উঠ্‌ল—দেখি, সে ত মার মুখ নয়, খোকার, কিন্তু ঠিক মায়ের মুখের মত – কৈ চিঠিটা?

দাদামশাই তাঁহার পকেট হইতে একখানা আফিসের চিঠি বাহির করিয়া কম্পিতহস্তে সুধাকে দিলেন। সুধা ইংরেজী জানেনা, এই ভরসা।

বাহিরের মেঘে চাঁদ ঢাকা পড়িয়াছে, বাতাস উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে, সাগরের ডাক ডমরুধ্বনির মত বাজিতেছে। কাশিয়া কাশিয়া বুকের যে পাঁজরগুলিতে ব্যথা হইয়াছে তাহাদের উপর রোগশীর্ণ হাতে চিঠিটা ধরিয়া সুধা শান্ত হইয়া শুইল। অন্ধকার রাত্রির তারাগুলি মাতার করুণ ব্যাকুল অনিমেষ চাউনির মত তাহার রোগশয্যার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। দাদামশাই ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া সম্মুখে বালির উপর বসিয়া অন্ধকারময় অনন্ত সমুদ্রের দিকে শূন্যনয়নে চাহিয়া রহিলেন। কিছু ভাবিবার, কাঁদিবারও তাঁহার যেন শক্তি নাই।

২

দুপুরবেলা ইজিচেয়ারে শুইয়া খোকার জন্য রেশমের মোজা বুনিতে বুনিতে শ্রান্ত হইয়া সুধা একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। দাদামশাই ধীরে তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন, ধীরে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন, চুল কত উঠিয়া গিয়াছে, মাথাটা যেন শুকাইয়া ছোট হইয়া গিয়াছে। কয়েকটা মাছি মুখে উড়িয়া বসিতেছে দেখিয়া তিনি ধীরে ধীরে পাখার মৃদু বাতাস করিতে লাগিলেন, শীর্ণ মুখখানি রোগের আভা-মণ্ডিত হইয়া কি করুণ!

সুধা একটু উস্‌খুস করিয়া জাগিয়া উঠিল; দাদামশাই পাখার

বাতাস করিতেছেন দেখিয়া মিটি মিটি চাহিয়া করুণ-মধুর হাসিল ; তারপর দাদামশাইয়ের হাত হইতে পাখাটি লইয়া বলিল—দাওনা দাদামশাই, তোমায় একটু হাওয়া করি—

আমি এই জানলাটা খুলে দিচ্ছি, তাহ'লে খুব হাওয়া আসবে—

আচ্ছা দাও, আজ কত তারিখ দাদামশাই ?

আজ বোধ হয় ১২ই—

ও ! তাহ'লে চারদিন আছে, জান ষোলই হচ্ছে খোকার জন্মদিন, ও এখনও মোজাটা কত বাকি, কিছু বোনা হয়নি, খালি ঘুমিয়ে পড়ি—

এখন তোমার যে পরিপূর্ণ বিশ্রাম দরকার।

না, এ আমায় বারণ করতে পারবেনা, এ-চারদিনে এটা আমায় শেষ করতেই হবে, আচ্ছা ষোলইয়ের মধ্যে খোকা নিশ্চয়ই এসে পড়বে - জানো আমি কি স্বপ্ন দেখছিলুম ? আমি দেখছিলুম, খোকা এসেছে, আমি তাকে এই মোজাটা পরিয়ে দিলুম, তারপর হরিণ-চামড়ার সুন্দর জুতো—কি সুন্দর দেখাচ্ছিল—আমার গলা জড়িয়ে চুমো খেয়ে বল্‌লে,—ভারি দুষ্টু মা, আমায় ফেলে এসেছিলে, আমার মন কেমন করে যে—দাদু, আচ্ছা আল্‌নাটায় ত তোমার কাপড় আর পাঞ্জাবী রয়েছে ত ? হ্যাঁ, ঠিক মনে হচ্ছিল, খোকার সেই লাল জরিপাড় ধুতিটা আর সিল্কের পাঞ্জাবীটা ঝুল্‌ছে—খোকা,—খ্যা !—

সহসা সুধার এক কাশির বেগ আসিল, কাশিতে কাশিতে খানিকটা রক্ত মুখ দিয়া উঠিল, কিছুক্ষণ বসিয়া মৃদু আর্ত্তনাদ

করিয়া শ্রান্ত হইয়া সে চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার হাতে বোনা রেশমের মোজাপরা খোকার কচি পা-দু'টি মুদিত নয়নের অন্ধকার পটে বার বার ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। সেই জুতা মোজা পরিয়া খোকা যেন দস্যিপনা করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহার দুরন্ত পায়ের শব্দের মত সাগরের তরঙ্গধ্বনি তাহার কাণে আসিয়া বাজিতে লাগিল।



গভীররাতে সুধা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে ভাবিয়া দাদামশাই নিঃশব্দ-চরণে তাহার ঘরে ঢুকিয়া তাহার শয্যার পাশে বসিলেন। সুধা কিন্তু জাগিয়াছিল, সে ধীরে বলিয়া উঠিল—কে, দাদামশাই? তোমাকে আজ সারাদিন দেখিনি কেন?

দাদামশাই শিহরিয়া উঠিলেন, তাঁহার চোখ দিয়া যে টসটস করিয়া জল পড়িতেছে তাহা সুধা অন্ধকারে বুঝিতে পারিল না।

আচ্ছা, দাদু কালত সকালে ওরা আসবে, দেখ, আমি ভোরে প্রায়ই ঘুমিয়ে পড়ি, আমায় কিন্তু কাল ভোরে জাগিয়ে দিও, ভোরবেলায়ই ত ট্রেণ আসে—

দাদামশাই গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—মাগো!

তাহার স্বামী ও পুত্র কাল সকালে আসিবে এই স্বপ্নমাধুরীতে সুধা নিমগ্ন ছিল, স্নেহসুধায় তাহার হৃদয় কাণায়-কাণায় ভরা। ধীরে সে বলিল—আচ্ছা, আজ কোন চিঠি আসেনি?

চিঠি সত্যই সেদিন একখানা আসিয়াছিল। সেটা সুধার

স্বামী লেখে নাই, তাহার দেবর দাদামশাইকে লিখিয়াছে। সে লিখিয়াছে, খোকার কয়েকদিন হইতে খুব জ্বর, বৌদির জন্য ভয়ঙ্কর কাঁদে। দাদা খোকার কান্নার জন্য বিরক্ত হইয়া আর রাতে বাড়ীই আসেন না, তিনি আগে মাঝ-রাতে বাড়ী ফিরিতেন, এখন সমস্ত রাতই বাহিরে থাকেন। বৌদিকে দেখিতে তাহার ভয়ঙ্কর ইচ্ছা করে, কিন্তু তাহার মা শাসাইয়াছেন, সে যদি দেখিতে যায় তবে তাহাকে আর বাড়ী ঢুকিতে দিবেন না। এদিকে খোকার চিকিৎসার কিছুই হইতেছে না, সে যে কি করিবে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। বৌদি কেমন আছেন তা যেন তাহাকে নিশ্চয় জানানো হয়। তরুণ মনের অনেক ব্যথার কথাই সে লিখিয়াছে। তাহার চিঠিখানি পাইয়া দাদামশাই আজ দিশাহারা হইয়া গিয়াছেন।

সুধা বলিল, মোজাটা কিন্তু একটু বোনা বাকী আছে, তা তার জন্যে খোকা রাগ করবেনা, কালই আমি শেষ করে দেবো— কিন্তু তুমি এলে, আর মনটা কেমন হু হু করছে—এতক্ষণ আমি আকাশের দিকে চেয়ে যেন খোকার মুখ দেখ্‌ছিলুম, তারাগুলো যেন তার সুন্দর চাউনি, না, আমার কেমন ভাল লাগছে না··· মনে হচ্ছে খোকার যেন ভয়ঙ্কর অসুখ কোরেছে, সে মা, মা, বলে কাঁদছে—অন্ধকারে হাৎড়ে বেড়াচ্ছে, আমাকে খুঁজে পাচ্ছেনা— দাদামশাই!

দাদামশাই আর আপনাকে দমন করিয়া রাখিতে পারিলেন না, এ মিথ্যার মায়া-জালে ভারাক্রান্ত হইয়া ছট্‌ফট্ করার চেয়ে সত্যে মুক্তি ভাল,—সে মুক্তি যতই নির্ম্মম ক্রূর বেদনাময় হোক্!

তিনি ভাঙাগলায় বলিয়া উঠিলেন—ওরে সব ফাঁকি, তোকে সব মিথ্যা—

সহসা তিনি থামিয়া গেলেন। সুধার কাশির বেগ আসিয়াছে। কাশিতে কাশিতে সে উঠিয়া বসিল, ঝড়ে-দোলা লতার মত কাঁপিতে লাগিল।

কাশি থামিয়া গেলে সুধা যখন একটু শান্ত হইল, দাদামশাই আর তাহাকে কিছু বলিতে পারিলেন না। অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে ডাকিলেন, মা!

না, দাদু, কষ্ট না, কিছু কষ্ট না, আমি এখন একটু ঘুমোতে চেষ্টা করি, আমায় কিন্তু ভোরে জাগিয়ে দিও।

৪

পরদিন বিকেল-বেলায় সমুদ্রতীরের সম্মুখে বারান্দায় বসিয়া সুধা তাহার খোকার ফটোটি দেখিতেছিল। এ ফটোটি তাহার দেবরের একবন্ধু তুলিয়া দিয়াছিল। খুব ভালো ওঠে নাই, তবু এই অস্পষ্ট ছবিখানি সে খোকার রূপমাধুরী দিয়া ভরিয়া দুই চোখ দিয়া পান করিতেছিল। ঘরের ভিতর দাদামশাইয়ের পায়ের শব্দ শুনিয়া সে ধীরে ডাকিল—দাদামশাই!

অপরাধীর মত দাদামশাই তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

তোমায় এম্‌নি ডাকলুম দাদামশাই, বোসোনা চেয়ারটায়।—দাদামশাই; তোমার পাকাচুলগুলো তুলি এস ত—

ওরে আমার সব চুলই যে পাকা!

দেখত কাণে কি ময়লা—বলিয়া সুধা আঁচল দিয়া কাণ পরিষ্কার করিয়া দিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু একটা কাণ পরিষ্কার করিয়াই পরিষ্কার করিবার উৎসাহ চলিয়া গেল। দাদামশাই তাহার মাথায় ধীরে হাত বুলাইয়া বলিলেন—কেমন আছিস, সুধা?

মন্দ কি, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে কি জান, আমি যেন নেই, আমি থাকা না-থাকার বাইরে গেছি—তুমি অমন করে চেওনা—হ্যাঁ, আমার এখন কিরকম মনে হচ্ছে জান? আমরা সব ছায়া, সব ফাঁকি, বাস্তব কিছু নেই—এই সাম্‌নে বালির পাড়, ওই যে সমুদ্দুর ঠিক যেন ছবির মত আমার চোখে লাগ্‌ছে, এই যে তুমি বসে' আছ, ওই যে লোকজন চলেছে, সব যেন ছবির মত ভেসে চলেছে—ওই যে খোকার ফটোটা আর এই যে বাইরের ঘর-বাড়ী জিনিষ-পত্তর লোকজন আমি কোন তফাৎ বুঝতে পারিনে—সব ছায়াবাজীর মত মনে হয়—মাঝে মাঝে আমি নিজের গায়ে চিমটি কেটে দেখি সত্যি আমি আছি কিনা—ফাঁকা সব ফাঁকা, এই ঘর, এই মন, এই আকাশ, সব ফাঁকা, তার মধ্যে সবাই ছায়ার মত ঘুরছি—তোমার কি এরকম মনে হয়?

সত্যিই রে ফাঁকি সব ফাঁকি, আমি মিথ্যা দিয়ে একটু সুখস্বর্গ তোর জন্যে রচনা কর্‌ছিলুম—কিন্তু ফাঁকি দিয়ে—ওরে—

তুমি কেঁদোনা দাদামশাই, আমি জানি, আমি ঠাকুরপোর চিঠি পড়েছি।

দাদামশাইয়ের সমস্ত দেহ রিম্‌ঝিম করিয়া উঠিল, তিনি চারিদিকে অন্ধকার দেখিলেন। দুচোখ দিয়া টস্‌ টস্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

তুমি কাঁদ্‌ছ, কিন্তু আমার চোখে ত জল আসে না দাদামশাই, আমার কাছে সব মায়া, মিথ্যা মনে হচ্ছে,—কে এল, কে এল না, কাকে দেখলুম, কাকে দেখলুম না, সব মিথ্যা—এ হাসি মিথ্যা, এ কান্না মিথ্যা, এ সুখ মিথ্যা, এ বেদনা মিথ্যা, সমস্ত সংসার যে ফাঁকি—তুমি কেঁদোনা দাদু—ওঃ!—উঃ!—

সুধার চোখে অশ্রু উৎসারিত হইয়া উঠিল না বটে, কিন্তু কাশির বেগ আসিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে, আকাশে কয়েকটি তারা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুধা বারান্দা হইতে উঠিয়া ঘরে চুপ করিয়া বিছানায় শুইয়াছিল।

সহসা সে বলিয়া উঠিল, দাদামশাই, তুমি ভেবোনা, তারা আস্‌বে, খোকার আসার সময় কাছে আসছে আমি বুঝতে পারছি, আস্‌ছে তারা—

দাদামশাই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

আচ্ছা, সবই যদি মিথ্যা, হয়ত ঠাকুরপোর চিঠিও ত মিথ্যা, তবে খোকা আস্‌বে না কেন? মাঝে-মাঝে অন্ধকার দেওয়ালের গায়ে আমি কি দেখতে পাই জান?—খোকার কাপড়, জামা, খেলনা, বাসন—তার ইঞ্জিন-গাড়ীটা এক নিমিষের জন্য দেওয়ালের গা দিয়ে চলে কোথায় অন্ধকারে পাড়ি দিলে—ওই তার পদ্মকাটা রেকাবখানা, দেওয়াল দিয়ে গড়িয়ে পড়্‌ল—তার দুধের বাটি তার সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে—ওরে বাছা—

সুধা, চুপ কর!

চুপ করব কি ; আমি যে শুনতে পাচ্ছি, সে আস্‌ছে—উনিও আস্‌ছেন—আস্‌বেন তিনি—তখন হয়ত আমার জ্ঞান থাকবে না, তখন হয়ত আমি তাঁকে চিনতে পারব না, কিন্তু তাঁর পায়ের ধূলো একটু আমার মাথায় দিও।

রাত্রি আরও গভীর হইয়াছে, আকাশ তারায় ভরিয়া গিয়াছে ; মৃদু চাপা আর্ত্তনাদের মত সমুদ্রের ডাক বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে।

না দাদামশাই, আমার কোন দুঃখ নেই, কারুর ওপর আমার রাগ নেই, তোমার কাছে আজীবন যে স্নেহ পেয়েছি, তা' ত ফাঁকি নয় ; আমার যাবার সময় আস্‌ছে, কিন্তু তোমাকে আমি ছাড়্‌বনা—আর জন্মে তুমি নিশ্চয় আমার ছেলে হয়ে জন্মাবে—তুমি আর ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারবে না—

না, মা তোকে আমি ফাঁকি দেবোনা—

হ্যাঁ, দাদামশাই, এ-জন্মে তুমি আমার যা করেছ তার আমি কিছু শোধ দেবো, ছেলেবেলায় কবে যে বাপ-মা হারিয়েছি কিন্তু তাঁদের অভাব কোনদিন আমায় বুঝতে দাওনি—এবার তোমাকে আমি বুকে করে মানুষ করব।

হ্যাঁ, মা, আমাকে তুই ছাড়িসনে—তুই যদি যাস্‌ ত আমাকেও নিয়ে চল।

কিন্তু তুমি ভাবছ দাদামশাই, আমি মিথ্যে বল্‌ছি,—না,—খোকা আস্‌ছে, আমি যে দেখতে পাচ্ছি, সেই ছোট-ঘরের কোণে

ম্লান প্রদীপের আলো, ময়লা বিছানায় সে এতক্ষণ ছট্‌ফট্‌ করছিল, ঠাকুরপো তাকে কোলে করে বসেছিল - সে কাঁদ্‌ছিল, আমার জন্য গুম্‌রে মরছিল—তার কান্না থাম্‌ল, হৃদয়ের বেদনা শেষ হ'ল, এবার সে যাত্রা করেছে—

সুধা!

হ্যাঁ, এবার আমাকে তৈরী হ'তে হবে তার জন্যে, তার মোজাটা আমার হাতে দাও ত, কিন্তু ঝিনুক, তুমি কিছু ঝিনুক কুড়িয়ে নিয়ে এস—ঝিনুক নিয়ে আমার সঙ্গে সে খেলা করবে—

মা!

কার সঙ্গে সে আস্‌ছে জান, সে মিথ্যা নয়, সে ফাঁকি নয়, সে মৃত্যু, সে স্বয়ং যম।



বৌদি!

দেখ সুধা কে এসেছে।

কে? মা, যাই মা, একটু দাঁড়াও, এখনও যে খোকা—

বৌদি! বৌদি কেমন আছেন দাদামশাই?

ওত আজ সন্ধ্যে থেকে ভুল বক্‌ছে, জ্ঞান নেই। খোকা কৈ?

খোকা ত' নেই দাদামশাই, তাকে বাঁচাতে পারলুম না, তাই ছুটে এলুম বৌদিকে যদি বাঁচাতে পারি।

তোমার মা আসতে দিলেন?

মাকে বলে এসেছি, মা, তোমাদের আমায় তাড়াতে হবে না, আমি তোমাদের ছেড়ে চললুম।

ওগো, কি মদের গন্ধ তোমার গায়ে, কত মদ খাও তুমি—উঃ কেমন জ্বর জ্বর লাগ্‌ছে, কত বাসন মাজব—

ভুল বক্‌ছে—

ভুল, ভুল সব ভুল—ওগো, চল্‌লে, ক'টা রাত হবে—শরীরে যে কিছু নেই তোমার—আজ নাই বা গেলে—

বৌদি, আমি এসেছি—

এসেছিস, আয়, আয় বাছা, কোলে আয়—তোর মা তোর জন্যে মরতে পারছে না—উঃ—উঃ—ওঃ—

প্রবল কাশির বেগ আসিল। রক্তবমন করিয়া সুধা বিছানায় লুটাইয়া পড়িয়া দীর্ঘশ্বাস টানিতে লাগিল।

অকূল অন্ধকারময় সাগরের ঝোড়ো বাতাসে ঘরের আলোর শিখা কাঁপিতে লাগিল। দাদামশাইয়ের চোখে সমস্ত সংসার অন্ধকার ফাঁকি মনে হইল। তিমিরাবগুণ্ঠিতা রহস্যময়ী স্তব্ধ স্নিগ্ধ রাত্রির মত মৃত্যু নিঃশব্দ-চরণে গৃহে প্রবেশ করিল।

ইরা

কফি পানের পর সুহৃৎ তার সিগারটা ছাই-দানিতে ঠেকিয়ে রেখে ব'লতে আরম্ভ ক'রলে,—

বড়দিনের ছুটিতে ট্রেনে দিল্লী যাচ্ছিলাম। পাটনা পার হতেই সকাল থেকে বিষ্টি সুরু হ'ল। পশ্চিমের দিকে বেশ শীত পাবে আশা করেছিলুম, বিষ্টি পাব ভাবিনি। অষ্ট্রিয়া থেকে দেশে ফিরে বাংলার বাইরে আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে দেখা ক'রে উঠতে পারিনি, সেজন্য কন্‌সেসন্ আরম্ভ হ'তেই কলিকাতা থেকে বার হয়েছিলাম প্রফুল্লচিত্তে, বহুদিন পরে দিল্লীর আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে মনে ভেবে। কিন্তু পথের বৃষ্টিভেজা দিনের কালো রূপের দিকে চেয়ে মন ভারী হয়ে গেল। আকাশের এমন বিচ্ছিরি কালো রং শীতের লণ্ডনের আকাশে কোন কোন দিন দেখেছি, তা'ছাড়া আর কোথাও দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না; এ যেন চঞ্চলগতি ইঞ্জিনের ধোঁয়ার কুণ্ডলী জ'মে জ'মে স্তরের পর স্তর ঘন অন্ধকার সৃষ্টি করেছে, ক্ষুদ্র নত আকাশ ছড়িয়ে দিকচক্রবাল জুড়ে সে অন্ধকার এক ঘেরাটোপের মত পথঘাট মাঠ বন ঘিরে আছে; প্রান্তরভরা ঝোড়ো হাওয়ার মধ্য দিয়ে হা হা শব্দে ট্রেণ যতই অগ্রসর হতে লাগল ততই মনে হ'ল অন্ধকারের এ সঘন আবরণ ধীরে ধীরে কাছে আরও কাছে এগিয়ে এসে চলন্ত ট্রেনকে চেপে জড়িয়ে ধরবে;

তারপর ইঞ্জিনের শ্বাসরোধ হয়ে যাবে, এক আশাহীন অন্ধ অন্ধকারের গর্ত্তে দিশাহারা হয়ে আমরা হাহাকার ক'রব, কিন্তু বাতাসের হতাশ্বাসে আমাদের আর্ত্তনাদ আমরা পরস্পরেও শুন্‌তে পাব না।

সারাদিন সারাপথ সেজন্য আকাশের দিকে চাইনি, একখানা ইতালীয়ান নভেলে মুখ গুঁজে পড়েছিলাম। মাঝে মাঝে বিষ্টির ঝাপটা জানালার কাঠের উপর করাঘাত করছিল অভিমানিনী নারীর মত।

এলাহাবাদের কাছাকাছি আস্‌তে বিকেল হয়ে এল, মনটা কেমন চঞ্চল হয়ে উঠল, ভূষাকালি দিয়ে লেপা শীত-সন্ধ্যার আকাশ বড় করুণ মনে হ'ল, যেন কোন বিরহিণী প্রতীক্ষিত প্রিয়ের পথের দিকে চেয়ে ক্লান্ত বিনিদ্র নয়নে রাতের পর রাত যে-সব প্রদীপের পর প্রদীপ জ্বালিয়েছে তাদের শিখা হতে কাজললতার জমান ভূষা এ আকাশভরা অন্ধকারে ছড়িয়ে গেছে ; মিলনের লগ্নে নয়নের কোণে যে কাজল জ্বল-জ্বল করত, তা আজ শূন্য আকাশের সজলতায় মিশিয়ে গেছে।

ট্রেন এলাহাবাদ ষ্টেশনে ঢুকতেই বুকের রক্ত দুলে উঠল। তাই ত! আশ্চর্য্য! মনেই হয়নি! ইরার কথা মনেই পড়েনি।

ইরা ও এলাহাবাদ আমার অন্তরে এক-তারে বাঁধা। ট্রেনে এলাহাবাদ পার হয়ে গেছি অথচ নেমে ইরার সঙ্গে দেখা ক'রে যাইনি, জীবনে এমন কখনও ঘটেনি।

কুলিকে ডেকে বেডিং স্যুটকেশ নামিয়ে তাড়াতাড়ি ষ্টেশনে নেমে পড়লাম। তাড়াতাড়ি একটা টাঙাতে গিয়ে উঠে বস্‌লাম।

মনে পড়ল, যতবার এলাহাবাদ ষ্টেশনে নেমেছি, ইরা নিজে ষ্টেশনে এসে আমাকে নিয়ে গেছে তাদের মোটরে। টাঙা ছোটাতে ব'লে দিলাম। বিষ্টি থেমেছে, কিন্তু ঠাণ্ডা কন্‌কনে বাতাস বইছে, ওভারকোটের বোতামগুলো এঁটে দিয়ে আকাশের দিকে চাইলাম, আকাশ একটু পরিষ্কার হয়ে আস্‌ছে, ভারী কালো ক্যানভাসের মত অন্ধকারের আবরণ পৃথিবীর ওপর চেপে ছিল, তা ধীরে ধীরে উপরে উঠছে।

ইরাদের বাড়ীটা ছিল শহর ছাড়িয়ে, শহর থেকে বহুদূরে নদীর ধারে। তার ঠাকুরদা ছিলেন এলাহাবাদের এক নাম-করা উকিল; শেষজীবনে তিনি ওকালতি ছেড়ে সন্ন্যাসী নিয়ে থাকতেন; শহরের মধ্যে পুরাতন আমলের বাড়ীতে থাকতেন না, নদীর তীরে উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে নির্জ্জনে বাংলা ধরণের বাড়ী করে ছিলেন। সে-বাড়ীর নাম এলাহাবাদের সব টাঙাওয়ালাদের জানা, সুতরাং পথনির্দ্দেশ করতে হ'ল না। স্তম্ভিত আকাশের তলে ভিজেমাটির গন্ধভরা পথের দুধারে গাছপালার সজল সবুজের দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলাম—কতদিন পরে আবার ইরাকে দেখব, আট বছর পরে! ইয়োরোপে যাবার সময় বোম্বাই যাবার পথে এলাহাবাদে একদিন থেমেছিলাম, তার পর সাত বছর অষ্ট্রিয়াতে কেটেছে, দেশে ফিরে ইরার কোনও খোঁজ নেওয়া হয়নি।

ভাবতে লাগলাম, আট বছর পরে ইরা কেমন দেখতে হয়েছে? তার একটি ফোটো কতবার চেয়ে পাঠিয়েছি, কিছুতেই পাঠায়নি। একটু বয়স হলেই বাঙালী মেয়েদের ফোটো তোলার সঙ্কোচবোধ কেন এত বেশী হয় বুঝি না; তারা বোঝে না, লোকে প্রিয়জনের

ফোটো চায় সুন্দর ব'লে নয়, স্মৃতি ব'লেও নয়, প্রেমের প্রতীক ব'লে; চায়, সে ছবি কল্পনাকে উদ্দীপিত করে।

তা ইরা যতই বদ্‌লাক, দেখলেই তাকে চিন্‌তে পারব। আমাকে হঠাৎ দে'খে সে কি অবাক্ হয়ে যাবে?

ভাবতে ভাবতে খেয়াল হয়নি, গাড়ীটা কখন শহর ছাড়িয়ে ক্রমান্ধকারাচ্ছন্ন শূন্য মাঠের মধ্যে নির্জ্জন পথ দিয়ে চলেছে, পশ্চিমের মেঘস্তূপের ওপর একটু সোনালী আলো ঝিক্‌মিক্ করছে।

সহসা সামনে এক প্রকাণ্ড গাছ সমস্ত পথ জুড়ে দাঁড়াল—গাছ নয়, গাছের কঙ্কাল—তার মোটা লম্বা গুঁড়ি হতে পত্রহীন বিবর্ণ শীর্ণ শাখাপ্রশাখার জাল ধূসর আকাশের পট জুড়ে নাগনাগিনীর মত দিগ্‌দিগন্তে প্রসারিত, পেছনে হাল্কা কালো মেঘে সন্ধ্যার রঙীন আভা ক্ষীণ রক্তের স্রোতের মত টানা।

চম্‌কে উঠলাম। সেই সময়ে গাড়ী থামল। গাড়োয়ান জানালে, বাড়ীতে হাজির হয়েছি। বজ্রদীর্ণ বৃহৎ বৃক্ষটির পাশে কালো বাড়ী চোখেই পড়েনি, গাছের নীচে তার অস্পষ্ট ছায়া দেখে মনে হ'ল, যেন এক বৃহৎ অক্‌টোপাস্ বক্র দীর্ঘ বাহুগুলি মেলে বাড়ীটাকে চেপে ধরেছে, তাকে পীড়ন করবে, শোষণ করবে!

ইরাদের বাড়ীতে আগে যতবার গেছি, সকাল বেলায় পৌঁছেছি। সূর্য্যের আলোভরা প্রভাতে এ বিজন শূন্য প্রান্তর প্রজ্বলিত প্রদীপের মত সুন্দর দেখাত, গাছপালায় নদীজলধারায় আলো ঝিকিমিকি করত। বাড়ীর পার্শ্বে এই বহু-প্রাচীন বৃক্ষটিকে পূর্ব্বে যতবার দেখেছি, তার শাখাপ্রশাখা ঘন সবুজ পাতার ভারে আনত; এক

অদ্ভুত রঙের ফুল ফুট্‌ত গাছটাতে, বাড়ী ঢোকবার পথের ওপর ছড়িয়ে থাকত। কিন্তু সেই স্তব্ধতাভারাক্রান্ত শীত-সন্ধ্যায় দিগন্ত-প্রসারিত শূন্য কৃষ্ণ প্রান্তরের মধ্যে নিকষমণির পেয়ালার মত আকাশের তলে শীর্ণ-জীর্ণ বৃক্ষবেষ্টিত স্তব্ধ বাড়ীটি শুধু অজানা নয়, রহস্যময় ভীতিপ্রদ ব'লে মনে হ'ল।

ঠিক সেই সময় পশ্চিমের মেঘস্তূপ ঠে'লে সূর্য্যের সপ্তাশ্বচালিত স্বর্ণরথের রক্তিম আভার প্রকাশ হ'ল, তার অগ্নিবর্ণ চক্রের দ্যুতিতে চারিদিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, বিষ্টি-ভেজা আকাশপ্রান্তর, কালো গাছের ডালের জাল, গোলাপ লতা-ছাওয়া প্রবেশদ্বার, টলমল নদী জলধারা সব এক অলৌকিক আলোকে ঝিলিমিলি করতে লাগল; সে আলো মুগ্ধ করে না, বুকের রক্তে দোলা দেয়।

বাড়ীখানা মৃতের মত স্তব্ধ, সাড়াহীন। অনেক ডাকাডাকির পর এক পশ্চিমে চাকর বার হয়ে এল, তার জ্বল-জ্বলে রাঙা চোখ, লম্বা কালো দাড়ি, মাথায় মোটা ঝুঁটি, সন্ধ্যার রঙীন আলো তার ওপর প'ড়ে তাকে অপার্থিব ক'রে তুলেছে। চাকরটি জানালে যে, সাহেব মেমসাহেব কেউ বাড়ীতে নেই, তবে এক ঘণ্টার মধ্যে মেমসাহেব আসবেন আশা করা যায়।

বেডিং স্যুটকেশ নামাতে ব'লে টাঙার ভাড়া চুকিয়ে বাড়ীতে না ঢুকে বাগানের দিকে গেলাম। ড্রয়িং-রুমের সামনে ফুলের বাগান নদীর তীরে; ওদিকে নদীতে প্রায়ই চড়া প'ড়ে থাকত, বালির ওপর বহুদূরে জল ঝিকিমিকি করত।

ফুলের বাগানটি ছিল আমাদের অতি প্রিয়; কি শরতে কি শীতে যখনই গেছি, দেখেছি, বাগানে ফুলের ঐশ্বর্য্য উপচে পড়ছে,

—গোলাপ, ক্রিসেনথিমাম্, ডালিয়া, য়্যাষ্টর, প্যান্সি, কার্নেশন, লিলি, আমরন্থাস্—রঙের ফুলঝুরি ; সকাল বিকাল বেতের চেয়ারে ব'সে ওখানে আমাদের চায়ের আড্ডা ও গানের সভা হ'ত।

কিন্তু বাগানে ঢুকে চোখে জল এল ; কি উদাস করা তার রূপ! সারাদিন রোদে ঘুরে জলে ভিজে না খেয়ে মা-হারা দস্যি ছেলে যখন সন্ধ্যায় বাড়ী ফেরে, তার যেমন উস্কখুস্ক করুণ মূর্ত্তি হয়, এ তেমনই মলিন বেদনাময়। কেতকীর ঝাড় ভেঙে পড়েছে, গোলাপের ডাল সব মাটিতে লোটাচ্ছে, করবীর ঝোপ লণ্ডভণ্ড ; যদি কোনও ফুল না ফুট্‌ত, সমস্তটা যদি জঙ্গল হয়ে যেত, তাহলে অত খারাপ লাগত না ; কিন্তু সেই অযত্ন-রক্ষিত বাগানে মাঝে মাঝে ফুল ফোটার প্রয়াস বড় করুণ। মনটা খারাপ হয়ে গেল, আর কন্‌কনে শীতের বাতাসে বেশীক্ষণ বাইরে থাকতে ইচ্ছাও করল না, বারান্দা পার হয়ে ড্রয়িং-রুমে ঢুকলাম।

প্রশস্ত ঘর, সুন্দর সাজান। ঘরের মাঝে রাশিচক্র আঁকা কারুকার্য্যময় পেতলের গোল টেবিলের ওপর এক মোরাদাবাদী ফুলদানিতে মার্সেল নীল ভরা, তার হলদে রং পেতলের রঙের সঙ্গে মিশে গেছে ; টেবিলের তিন দিক জুড়ে লক্ষ্ণৌ ছিট দিয়ে ডবল স্প্রিঙের গদি-মোড়া সোফা, সোফ্তি, চেয়ার সাজান ; চারকোণে পেতলের বড় গামলাতে পাম গাছ। স্কাই-লাইটগুলি দিয়ে ঝরা সন্ধ্যার মলিন আলোতে সব অস্পষ্ট আবছায়াময় দেখাচ্ছিল ; বলাকারদল-আঁকা জামরঙের পর্দ্দাটা সরিয়ে একটা ফ্রেঞ্চ-জানালা খুলে দিলুম ; বাহিরে আকাশ আরও রাঙা হয়ে উঠেছে, ভয়ঙ্কর কালো মেঘপুঞ্জের ফাঁক দিয়ে ঝরা সে আলো, যেন কোন তীরবিদ্ধ

কালো পাখীর বুক থেকে রক্ত ঝ'রে পড়্‌ছে। সে অপূর্ব্ব রঙীন আলোয় ঘরটা অবাস্তব হয়ে উঠল। চোখে পড়ল, ফায়ার প্লেসের ম্যাণ্টেলপিসের ওপর নটরাজের ব্রঞ্জের মূর্ত্তি, নীল দেওয়ালে যেন কালো কালীতে আঁকা, এই মূর্ত্তিটির সঙ্গে বাড়ীর পাশে দিগন্তবিস্তৃত বক্রশীর্ণ শাখাময় গাছটির সাদৃশ্য অনুভব ক'রে চমকে উঠলাম, সে গাছটিও যেন এই মূর্ত্তিটির মত কোনও তাণ্ডবনৃত্যে যোগ দিতে চায়!

মূর্ত্তিটির ওপর দেওয়ালে এক বড় ছবি—ভান গঘের "সূর্য্যমুখীফুল"—মেহগনির ফ্রেমে বাঁধান, এ ছবিটা আমি পাঠিয়েছিলাম ম্যুন্‌সেন থেকে ইরার বিবাহের উপহার রূপে। রঙীন আলোছায়ার স্বর্ণপীত-বর্ণের ফুলগুলি আগুনের ফুলকির মত জ্বলজ্বল ক'রে উঠল।

ঘরটি আগেকার মতনই সাজান, তবু সব জিনিষ কেমন অজানা, ঘরে-বাইরে অলৌকিক আলো; বড় অসোয়াস্তি অনুভব করলাম।

ফায়ার প্লেসের ডানদিকে দরজা, পাশের ঘরে যাবার; বাঁদিকে রিভলভিং বুক কেস্। বুক কেসের ওপর ম্যাগাজিনের গাদা ঘাঁটতে গিয়ে এক ছবির য়্যাল্‌বাম্ হাতে ঠেক্‌ল, সেইটা নিয়ে একখানা চেয়ার টেনে বস্‌লাম ফ্রেঞ্চ-জানলার কাছে। স্কাইলাইটগুলি নিষ্প্রভ হয়ে এল, যেন ঘুম-পাওয়া ছেলের ক্লান্ত চাউনি; সিলিংর পর খানিকটা দেওয়াল হল্‌দে রঙের, তারপর হাল্কা নীল, যেন একটা হলদে পাড়ের নীলশাড়ী বহুদিনের ব্যবহারে মলিন, সন্ধ্যার আলো-ছায়ায় টেবিল-চেয়ার ফুলদানী পিয়ানো সব ঘর করুণ কাতরতায় ভরা।

মন প্রফুল্ল কর্‌তে য়্যাল্‌বাম্‌টা খুললাম, ইরার ফোটোর য়্যাল্‌বাম্‌, আমারই তোলা তার নানা বয়সের ফোটো। য়্যাল্‌বাম্‌টা খুলতেই এলাহাবাদের সেই বিজন নদীতীরের রঙীন করুণ সন্ধ্যা মিলিয়ে গেল, আমার প্রথম-যৌবনের প্রথম প্রেমস্বপ্নমধুর দিনগুলির ছবি ভেসে উঠল।

তখন ইরা ছিল আমার বোন বিভার সহপাঠিনী বন্ধু, কলেজে একসঙ্গে পড়ত। তার বাবা এলাহাবাদে থাকতেন, সেজন্যে মেয়েকে কলকাতার কলেজের বোর্ডিংএ রাখতে হয়েছিল; কিন্তু ইরা চিরদিন বাড়ীতে মানুষ, বোর্ডিংএ তার মন টিঁক্‌ত না, শুধু শনি-রবিবার নয়, সব ছোট ছুটিতে আমাদের বাড়ী ছিল তার বন্ধুত্বের আশ্রয়, তার গল্পের আড্ডা, গানের আসর। কলেজ-জীবনে আমি তাদের সিনিয়ার ছিলাম, সেজন্যে পড়াশোনা সম্বন্ধে পরামর্শ দিতে আমার ডাক পড়ত তাদের আড্ডায়; পরামর্শ দেবার পরও থেকে যেতাম; ইরা প্রথম প্রথম একটু সঙ্কোচবোধ করলেও কিছুদিন পরে আমি না হ'লে তাদের আড্ডা জমতই না, গানের আসরে সঙ্গত করবার লোকের অভাব হ'ত।

ধীরে ধীরে ইরাদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ যোগ হয়ে গেল; ইরার বাবা মা কলকাতায় এলে আমাদের বাড়ীতেই উঠতেন, আর পূজার ছুটিতে প্রতি বছর বিভাকে নিয়ে আমায় এলাহাবাদে ছুটতে হ'ত।

প্রথম-যৌবনের হারান দিনগুলি থেকে একটি সুন্দর মধুর ক্ষণ শুভ্র মুক্তার মত স্মৃতি-সমুদ্রের অতলতা হতে উঠে এল।

শরতের এক দুপুরবেলা। পূজার ছুটির ক'দিন বাকী।

চারতলার ছাদে সিঁড়ির পাশে আমার পড়বার ছোট ঘরে বসেছিলাম, সামনে কি একটা পরীক্ষা ছিল, বইয়ের রাশি চারিদিকে স্তূপীকৃত, পড়ায় মন ছিল না।

সেদিন শরৎ-মধ্যাহ্নের অপরূপ সূর্য্যালোক ছিল স্তব্ধ অতলতায় বিলীন, সামনে পান্নাসবুজ মাঠের ওপারে সাদা বাড়ীর সারির উপর সুবিস্তীর্ণ দিক্‌চক্রবাল ভ'রে শুভ্র মেঘের পুঞ্জ দেখাচ্ছিল যেন সাগরগামী বলাকার দল সাদা ডানা মুড়ে ঘেঁসাঘেঁসি চুপ ক'রে শুয়ে আছে; অন্তরে কোনও চঞ্চলতা ছিল না, শুধু ইচ্ছা হচ্ছিল, ওই মেঘস্তূপের মত আকাশের সুনীল শয্যায় শুয়ে দক্ষিণ ফ্রান্সের রৌদ্রপুষ্ট দ্রাক্ষাগুচ্ছের রসধারাময় সোনালী মদিরার মত শরতের আলোকধারা পান করি উপছে-পড়া ইন্দ্রনীল পেয়ালা থেকে।

ইজিচেয়ারে ব'সে দিবাস্বপ্নের জাল বুনছিলাম। কার ডাকে চম্‌কে উঠলাম! চেয়ে দেখি দরজার সামনে ইরা! ইরা বিভাকে খুঁজতে ছাদে এসেছে। বললাম, এস, কি সুন্দর নীল আকাশ দেখ! বললে, না, তোমার পড়ার ক্ষতি হবে। বললাম, মোটেই না, তুমি একটু গল্প ক'রে গেলে তারপর পড়ায় মন বসতে পারে, কিন্তু এমনি যদি চ'লে যাও, তারপর পড়াশোনা অসম্ভব হবে। মৃদু হেসে সে ঘরে ঢুক্‌ল। ইজিচেয়ারে তাকে বসিয়ে তার পাশে বেতের চেয়ারে বসলাম।

কি গল্প হয়েছিল মনে নেই, অতি তুচ্ছ সামান্য কথাই হবে, জলবিম্বের মত অলীক। সেদিন ইরাকে বড় সুন্দর দেখেছিলাম— পিচফল রঙের শাড়ীর সবুজ পাড় কালো চুলের ওপর, হাতে কয়েকগাছি সোনার চুড়ির ঝিকিমিকি, হরিণের মত কালো দুই

চোখে স্বপ্নলোকের আভা,—সে শরতের মধ্যদিনে নির্জ্জন ছাদের কোণে আমার গ্রন্থবিকীর্ণ ছোট ঘরের মধ্যে ইজিচেয়ারে হেলিয়ে-বসা শ্যামলী কিশোরীর মুখে যে অপরূপ সৌন্দর্য্যালোক দেখেছিলাম, সে সৌন্দর্য্য জীবনে আর কখনও দেখব না! গল্পে গানে হাসিতে বিষ্টিতে ভরা সেই দুপুরবেলার তুলনা কোথায়!

এক পশলা বিষ্টি এল, বিষ্টির ছাঁট ঘরে আস্‌তে লাগল, আমাদের চোখেমুখে। বললাম, ইরা, একটা বর্ষার গান গাও।

হেসে বললে, কি বল, এ শরতের ক্ষণিক ধারার সঙ্গে কি বর্ষার গান গাওয়া যায়, গান আরম্ভ করতে করতেই যে বর্ষণ শেষ হবে। বললাম, বড় ইচ্ছে করছে একটা গান শুনতে। রহস্যময় চোখে একটু হেসে উঠল, বড় সুন্দর ছিল তার হাসি, গাল দুটি একটু রাঙা হয়ে ফুলে উঠত, দু-চোখের তটে কিসের কাঁপন লাগত।

বললে, একটা নতুন গান শিখছি, শোন, কিন্তু আস্তে আস্তে গাইব।

ঝিরিঝিরি বাদলধারার সঙ্গে সে মৃদুস্বরে গাইতে আরম্ভ করলে —'এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর!' যখন গান থাম্‌ল বিষ্টি থেমে গেছে, কৃষ্ণচূড়া ও নারিকেল গাছের পাতাগুলি ঝিকিমিকি করছে, কিন্তু আমার মনে যে মাদল বাজতে সুরু হয়েছিল তা আর থাম্‌তে চাইল না। ধীরে ইরার হাতখানি নিজের হাতে টেনে নিলাম, বারিস্নাত আকাশের আলোর মায়ার দিকে চেয়ে সে হাত ধ'রে কতক্ষণ বসেছিলাম জানি না, যখন খেয়াল হ'ল দেখি ইরা উঠে চ'লে গেছে।

সেই ইরাকে এতদিন পরে আবার কি রূপে দেখব!

য়্যাল্‌বাম্‌টা মুড়ে চারদিকে চাইতে চম্‌কে উঠলাম। আমি যখন এক শরৎ-মধ্যাহ্নের সুমধুর স্মৃতির স্বপ্নরাজ্যে ছিলাম, ধীরে ধীরে সন্ধ্যার রঙীন মায়া মিলিয়ে গেছে, রাত্রির নিবিড় তিমিরে ঘরবাড়ী পথ মাঠ নদী আকাশ ঘন আচ্ছন্ন; আকাশে একটি তারাও নেই, ঘরে টেবিল চেয়ার ছবি ফুলদানি সব অন্ধকারে একাকার।

মনে হল, বহুক্ষণ ঘরে ব'সে আছি! গভীর রাত হয়ে গেছে! কিন্তু কই, ইরা এল না! চাকরটা কোথায়? একটু ভয় ক'রে উঠল।

দাঁড়িয়ে উঠে চাকরটাকে একটা হাঁক দেব ভাবছি, একটা জোলো ঝোড়ো বাতাসে ফ্রেঞ্চ-জানলার কাচগুলি ঝনঝন ক'রে উঠল, পর্দ্দাগুলো দুলিয়ে এক সুদীর্ঘনিশ্বাস ঘরের অন্ধকার গুলিয়ে দিলে। তারপর সব নীরব; কি গভীর স্তব্ধতা! কালো পাথরের মত সে স্তব্ধতা পৃথিবীর বুকে চেপে, ঘরের অন্ধকারে সে স্তব্ধতা ঘনীভূত কালো পিচের মত। দাঁড়াতে গিয়ে পা কেঁপে উঠল; চেঁচাতে গিয়ে গলার স্বর বার হ'ল না।

অন্ধকার যেমন শব্দহীন তেমনই সঘন; নিজের হাতও দেখা গেল না; কোথাও একটু আলো নেই? প্রদীপের একটু স্তিমিত শিখা? চোখ দু'টো জ্বলতে লাগল। পকেটে দেশলাইও নেই, আলোর সুইচটাই বা কোথায়! কিন্তু সেই কৃষ্ণ স্তব্ধতায় একটু নড়তে, উঠতে, শব্দ করতে ভয় হ'ল।

চোখ বুজতে চাইলাম, পারলাম না; সে মহানীরব তিমিরপুঞ্জ আমাকে যাদু করলে, ক্ষুধিত চোখে চেয়ে রইলাম কি দেখবার আশায়!

মনে হ'ল, ফায়ার প্লেসের ডানদিকের দরজাটা কে খুললে; দরজা খোলা কি বন্ধ অন্ধকারে তা কিছুই দেখা যায় না; বাহিরের রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে ঘরের অন্ধকার এক হয়ে গেছে; তবু মনে হ'ল, কে দরজা খুললে; শব্দ একটু হ'ল না, নিস্তব্ধতা তেমনই ভয়ঙ্কর; তবু মনে হ'ল, দরজা খুলে কে দরজার পাশে চেয়ারে বস্‌লে; যে বস্‌লে তাকে দেখতে পাওয়া অসম্ভব, নীরন্ধ্র অন্ধকারের পটে আরও নিবিড়তম ঘনীভূত ছায়া; তবু মনে হ'ল, পিচফল রঙের শাড়ীর সবুজ পাড় কালোর ওপর: সে অন্ধকারে রক্তিম পীত সবুজ নীল সব একাকার; তবু মনে হ'ল, সবুজ পাড়ের পিচফল রঙের শাড়ী অন্ধকারে রঙীন কুজ্ঝটিকার মত।

তারপর যা ঘট্‌ল তা ভাষায় বোঝান অসম্ভব। বড় বিচিত্র, ভাষাতীত সে অনুভূতি।

দেখলাম বললে ভুল হবে; সে অন্ধকারে কিছু দেখা সম্ভবপর ছিল না; কিন্তু আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করলাম, আমার চৈতন্য দিয়ে; যে মূর্তিটি দরজার পাশে চেয়ারে বসেছিল, সে ধীরে উঠল, আমার দিকে করুণ নয়নে চাইলে, তারপর সে অন্ধকারে ঘরে ব'সে একা গান গেয়ে উঠল!

'এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর!'

সে গানের সুর যন্ত্রের না মানবকণ্ঠের, ভৌতিক না স্বাভাবিক তা বিচার করবার বুদ্ধি তখন লুপ্ত, সময়ের গতির উপলব্ধি ছিল না।

অনুভব করলাম, অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ সব কালের ধারা এক সঙ্গমে মিশে এক স্রোতে প্রবাহিত ; সেই সম্মিলিত প্রবাহের সঙ্গে এই ঘরবাড়ীভরা পৃথিবীব্যাপী গভীর স্তব্ধ অন্ধকার আমার চারদিকে আবর্ত্তিত হচ্ছে ; সুর জেগে উঠছে সে আবর্ত্তনে ! এ সুর তিমিরময় স্তব্ধতার সৃষ্টি, তারই আলোড়নে উৎসারিত। এ শব্দকে স্তব্ধতা চায় না, এ ধ্বনিকে নীরব করতে চায়। কিন্তু নবজাত সুরধ্বনি আপন আনন্দে অন্ধ তমিস্রময় নিস্তব্ধতার কঠিন শিলাকে খান্ খান্ করে ভাঙ্‌তে চায়।

শব্দের সঙ্গে নিস্তব্ধতার দ্বন্দ্ব চলেছে ; তাই, কখনও গানের সুর ক্ষুব্ধ, কর্কশ, লড়াই করছে ; কখনও সে সুর করুণ অশ্রু-জলসিক্ত, অন্ধ নীরবতা ভেদ ক'রে একটি শব্দের কমল ফোটাবার বেদনায় আতুর।

শেষে নিঃশব্দতার জয় হ'ল। গান শেষ না হয়ে সহসা থেমে গেল। মহানীরবতা এ অশান্ত সুরধ্বনিকে আপনার মধ্যে সংহত বিলীন ক'রে নিলে, সমুদ্র যেমন আপন বক্ষের চঞ্চল তরঙ্গকে আবার আপনার অতলতায় শান্ত করে।

তারপর, সে সঘন অন্ধকারে কি ভয়াবহ নিস্তব্ধতা ! যেন প্রলয়শেষে মহানিশার মহাভয়ঙ্কর নিশ্চল চির প্রশান্তি !

এতক্ষণে ভয় পেলাম। সে নীরবতায় গা সির সির ক'রে উঠল ! ভৌতিক ! কথাটা মনে হতেই হাত-পা কাঁপতে লাগল। যতক্ষণ গানের শব্দ ছিল, যাদুমন্ত্রে মুগ্ধ ছিলাম, অন্ধকার ছিল ঐন্দ্রজালিক সুরে ভরা। কিন্তু গান থাম্‌তেই চেতনায় সহজবুদ্ধি ফিরে এল। সে বুদ্ধি বললে, গানটা ভৌতিক।

বেশ অনুভব করলাম, হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আস্‌ছে ; দেহের রক্ত চলাচল ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর ; এ নিস্তব্ধতায় শুধু একমাত্র শব্দ হচ্ছে আমার বক্ষের স্পন্দনধ্বনি, সে ধ্বনি এ নীরবতায় ছন্দ-হারা ; বুকের এ ধুক্‌ধুকানির শব্দ মৃদু হতে মৃদুতর হচ্ছে, ধীরে ধীরে এ মহানিঃশব্দতায় বিলীন হয়ে যাবে, গানের সুর যেমন নীরব হয়ে গেল।

শব্দ, একটু শব্দ না হলে আমি ম'রে যাব !

ঠিক সেই সময় ঝড় উঠল ; নদী পার হয়ে, বাড়ী কাঁপিয়ে, দরজা জানলা দুলিয়ে ঝোড়ো হাওয়া হা হা শব্দে মাতালের মত ঘরে ছুটে এল, ভান্‌ গঘের ছবিটা ঝন্‌ঝন্‌ ক'রে প'ড়ে গেল, তারপর এক প্রচণ্ড শব্দ শুনে আমি লাফিয়ে উঠলাম। মনে হ'ল, মত্ত ঝঞ্ঝা এক প্রকাণ্ড বনকে নিৰ্ম্মূল ক'রে তুলে, গাছপালাগুলিকে তাণ্ডবনৃত্যে নাচাতে নাচাতে নিরুদ্দেশে নিয়ে যাচ্ছে !

আমি নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি, ঠিক সেই সময় সে ঝড় যদি না উঠত, সে গাছভাঙার ভয়ঙ্কর শব্দ যদি না আসত, তাহলে আমি তিমিরময় মহানীরবতার ভারে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়তাম, হয়ত বুকের স্পন্দনধ্বনিও নীরব হত।

ঝড়ের বাতাসের সঙ্গে আমি নেচে উঠলাম, মরিয়া হয়ে বারান্দায় ছুটে বার হয়ে গেলাম, দেহের রক্তস্রোত আবার দ্রুত তালে নাচতে লাগল ঝড়ের মত্ত নৃত্যের ছন্দে। চীৎকার ক'রে উঠলাম, আছি, আমি আছি ! ঝড় তার প্রত্যুত্তরে হাঃ হাঃ ক'রে অট্টহাস্য ক'রে উঠল। হাত ছুঁড়ে চীৎকার ক'রে ছুটোছুটি আরম্ভ ক'রে দিলাম পাগলের মত,—নিজেকে কোনরকমে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

ঝড়ের বাতাসে বারান্দায় মাঠে কতক্ষণ দাপাদাপি করেছিলাম জানি না, একটা মোটরের হর্ণ শুনে আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। চিরপরিচিত সে শব্দ কি মধুর লাগল !

মোটরের তীব্র আলো বাড়ীর দরজার দিকে এগিয়ে এল ! আলো ! আলো ! জয়, তিমিরবিদারক আলোর জয় ! আলো দে'খে এত আশা এত আনন্দ হ'তে পারে, জীবনে কখনও অনুভব করিনি। অধীর হয়ে মোটরকারের হেড-লাইটের দিকে ছুটে গেলাম। রাতের অজানা ভৌতিক পৃথিবী দুঃস্বপ্নের মত মিলিয়ে গেল।

ড্রাইভার আমার পাশ কাটিয়ে বাগানের দক্ষিণে সদর বারান্দার সামনে গাড়ী থামালে। কালো দাড়িওয়ালা চাকরটা কোথায় ছিল, সে তাড়াতাড়ি বারান্দার ইলেকট্রিক আলো জ্বালিয়ে মোটরকারের দরজা খুলে বল্‌লে,—এক সা'ব আয়া !

গাড়ী থেকে এক তরুণী নামল ; মনে হ'ল তাকে চিনলাম, ইরা ! আট বছর আগে ইরাকে যেমন দেখেছি, ঠিক তেমনই আছে !

মেয়েটি গাড়ী থেকে নেমে চাকরকে বল্‌লে, কে ?

ইরার গলার স্বর একটু বদ্‌লেছে। আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, আমি ! চিন্‌তে পাচ্ছ ? কেমন আছ ইরা ?

বিস্মিত হয়ে সে আমার মুখের দিকে তাকালে, তারপর ম্লান হেসে বললে, ও, আপনি ! আপনি সুহৃৎদা ! আমি রেবা !

—রেবা ! কত বড় হয়েছ ! ঠিক তোমার দিদির মত দেখতে হয়েছ ! দিদি কোথায় ?

—দিদি! দিদি! তার মুখ ছলছল ক'রে উঠল।

—কি? রেবা!

—দিদি! দিদি নেই, ছ'মাস হ'ল মারা গেছেন। আপনি দেশে ফিরেছেন শুনেছিলাম, কিন্তু আপনার ঠিকানা কারুর কাছ থেকে জানতে পারলাম না, একটু খবর দিতে পারিনি।

—ও!

—আসুন!

—না, আর বসব না, আমি যাই, রাতের ট্রেনেই দিল্লী যেতে হবে।

সে কি বল্‌তে যাচ্ছিল, আমার মুখ দে'খে ভয় পেলে।

একটু পরে বললে,—আজ রাতেই যেতে হবে? আচ্ছা চলুন, আপনাকে ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসি।

বাড়ী ছেড়ে মোটরকারে বার হলাম। বিষ্টি আরম্ভ হ'ল; ঝোড়ো হাওয়া নদীর এপার থেকে ওপার পর্য্যন্ত মর্ম্মভেদী হাহাকারে আর্ত্তনাদ করছে। পেছন ফিরে চাইতে জনশূন্য তৃণশূন্য প্রান্তরের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত বিদীর্ণ ক'রে বিদ্যুৎ চম্‌কে উঠল; তার তীব্র চঞ্চল আলোয় দেখলাম, বাড়ীর ওপর সেই শীর্ণ কৃষ্ণ বৃহৎ বৃক্ষটি নেই, ঝড়ে ভেঙে পড়েছে। বুঝলাম, তারই ভেঙে পড়ার শব্দে আমি ঘরের নীরব অন্ধকারে চমকে লাফিয়ে উঠেছিলাম, প্রাণ পেয়েছিলাম। শুধু সে গাছের কয়েকটি শুকনো ডাল বাড়ীর পাশে ঝড়ের বাতাসে বড় করুণভাবে দুলছে, যেন কোনও রোগিণীর অস্থিসার দীর্ঘ আঙুলগুলি ন'ড়ে ন'ড়ে হাতছানি

দিয়ে ডাকছে, অন্ধকারে আকাশে হাতড়ে হাতড়ে যাকে খুঁজছে তাকে পাচ্ছে না।

সেদিকে আর চাইতে পারলাম না, ছু'চোখে জল ভ'রে এল, সামনে গর্জ্জমান অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইলাম। রেবাও চুপ ক'রে আমার গা ঘেঁসে ব'সে রইল। সারা পথ কোনও কথা হ'ল না।

ষ্টেশনে আমাকে নামিয়ে রেবা বললে, ফেরবার পথে নামা চাই কিন্তু।

দিল্লী থেকে ফেরবার পথে এলাহাবাদে নিশ্চয় নামব, কথা দিয়ে রেবার কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

মালতী

১

ভাদ্রের নদী কানায় কানায় ভরা; কোথাও তরঙ্গের ভঙ্গী নাই; দুই তীরের সুবর্ণ-বর্ণের শস্যক্ষেত্র জলমগ্ন; সুবিস্তীর্ণ জলরাশি দিগন্ত ব্যাপিয়া—শান্ত পরিপূর্ণতার রূপ! শরত-প্রভাতের স্বচ্ছ আলোকে হরিতশ্যাম চিত্রপট ঝলমল করিতেছে; মাঝে মাঝে নদী-জলধারা মৃদু বাতাসে আন্দোলিত হইয়া ছলছল করিয়া উঠিতেছে।

ডেপুটিবাবুর বজরা ধীরে চলিয়াছে। মাঝিরা সারা রাত্রি লগি ঠেলিয়া ঠেলিয়া এক প্রকাণ্ড বিল পার হইয়া শ্রান্ত; ভোর বেলা বজরা বড় নদীতে আসিয়া পড়িয়াছে; সকালের বাতাস উঠিতেই পাল তুলিয়া দিয়া মাঝিরা তাম্রকূট সেবনের বন্দোবস্ত করিতেছে।

সুকুমার 'টুরে' বাহির হইয়াছে। সঙ্গে স্ত্রী মনোরমা। বিবাহ বহুদিন হইয়াছে কিন্তু ডেপুটি-গৃহিণীর কোনও সন্তান হয় নাই। স্বামী 'টুরে' বাহির হইলে তিনিও স্বামীর সহিত বাহির হ'ন। তা ছাড়া, এবার জমিদার-বাড়ীর বজরা পাওয়া গিয়াছে, পৃথক রান্নাঘর, স্নানের ঘর প্রভৃতির অত্যন্ত সুবন্দোবস্ত; পাড়িও দীর্ঘ।

বজরার ছাদে এক বেতের চেয়ারে বসিয়া সুকুমার শারদ-নদীর

শোভা দেখিতেছিল,—জলময় অগাধ পরিপূর্ণতা, দিকে দিকে রৌদ্রোজ্জ্বর শ্যামশ্রী, আকাশে নির্ম্মল নীলিমা। পৃথিবী যে কি অপূর্ব্ব সুন্দরী, তাহা সে কোনও দিন এমন গভীর ভাবে অনুভব করে নাই। কিন্তু এই বাধাহীন সোনালি আলোকময় আকাশ, এই বহুদূরবিস্তৃত স্তব্ধ জলরাশি, এই মৃদু হিল্লোলিত শস্যক্ষেত্রের গাঢ় সবুজ হইতে চঞ্চল মেঘস্তূপের মায়াময় শুভ্রতা পর্য্যন্ত অসীম পৃথিবী ভরিয়া যেমন গভীর শান্তি তেমনই করুণাপূর্ণ বিষণ্ণতা। সুকুমারের দুই চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের সহিত বুঝি গভীর বেদনা জড়িত।

নদীটি একটু সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে, অদূরে ছোট গ্রাম, তীরে বড় নারিকেল, খেজুর, আম নানা প্রকার ছায়াতরু, বাঁশবন, শরবন।

একটি বৃহৎ বটবৃক্ষ, অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহের মত, জীর্ণ, স্তব্ধ। পাতা প্রায় সব ঝরিয়া পড়িয়াছে, শুধু সুদীর্ঘ শাখা-প্রশাখাগুলি আঁকিয়া বাঁকিয়া বিদ্যুল্লতার মত কোন মত্ত আবেগে দিগ্‌বিদিকে প্রসারিত! মাঝিরা সেই পুরাতন বটবৃক্ষের নীচে বজরা বাঁধিল।

চাপরাসী সেলাম করিয়া নিবেদন করিল, হুজুর নন্দিগ্রাম যেতে হলে এখানে নামতে হবে। নন্দিগ্রামের পেয়াদা ঘাটে ব'সে আছে দেখছি।

পথে নন্দিগ্রামে ইন্‌স্পেক্‌সানে যাইবার কথা। সুকুমার উঠিয়া দাঁড়াইল। কোট প্যাণ্ট্‌ পরিয়া চা খাইয়া সে তৈরীই ছিল। চাপরাসীকে বলিল, আমার হ্যাট ও ছড়ি নিয়ে এসো। নন্দিগ্রাম এখান থেকে কতদূর?

চাপরাসী উত্তর দিল, আজ্ঞে দু' মাইল পথ হবে।

সুকুমার বুঝিল, দুই ক্রোশের কম হইবে না, ঘোড়া পাইলে সুবিধা হইত। পাল্কী বা গরুর গাড়ীতে যাওয়ার চেয়ে হাঁটিয়া যাওয়া ভাল। শীঘ্র বাহির হওয়া দরকার।

ডেপুটি-গৃহিণী বজরার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন, ওগো, বেশী দেরী ক'রো না। আর আরদালীকে দিয়ে দু'টো মুরগী পাঠিয়ে দিও, শীগ্‌গির, মিঠে কোর্ম্মা করব, কেমন?

সুকুমার তাহার স্ত্রীর দিকে বিস্মিত হইয়া চাহিল। আট বৎসর তাহাদের বিবাহ হইয়াছে, তবু মাঝে মাঝে কেন মনে হয়, তাহার স্ত্রী তাহার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিতা, সে অবাক্ হইয়া যায়।

স্ত্রী বলিলেন, কি, অমন হাঁ ক'রে চাইছ কি? দেখ, আলু আর দু'দিন হবে, এ গ্রামে যদি আলু পাওয়া যায়, দেখো ত'।

আচ্ছা—বলিয়া সুকুমার মাথায় সোলার টুপি দিল।

২

তীরে নামিয়া একটু চলিতেই সুকুমার চমকিয়া উঠিল, থমকিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিকে বিস্মিত নয়নে দেখিতে লাগিল। এই গ্রাম, এই পথ তাহার বহু-পরিচিত মনে হইল, যেন কোন্ পূর্ব্ব-জন্মে দেখা, কোন্ স্বপ্নে জানা। তাহার মনে হইল, এমনি এক করুণ মধুর প্রভাতে ওই বটগাছের নীচে তাহাদের নৌকা আসিয়া লাগিল, সে তাহার বন্ধুর সহিত উৎসুক অন্তরে আনন্দে তীরে নামিল,

হাস্যে গল্পে গ্রাম্য-পথ মুখরিত করিয়া চলিল। সে কি কোনও স্বপ্নে এই শান্ত সৌন্দর্য্য-লোকে আসিয়াছিল ?

ধীরে সুকুমারের মনে পড়িল। বোধ হয় নয় বৎসর পূর্ব্বে হইবে। তখন সে এম্-এ পড়ে। সতীশ রায় তাহার অন্তরের বন্ধু ছিল। সে কলিকাতায় মানুষ, বাঙ্লার গ্রামের সহিত বিশেষ পরিচিত নয়। কোনও ছুটিতে সতীশ তাহাকে জোর করিয়া নিজের দেশে লইয়া আসিয়াছিল। এমনই সুন্দর প্রভাতে সতীশ ও সে কি আনন্দে ওই বটগাছের ধারে নৌকা হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছিল ! বটগাছটি এমন জীর্ণ কঙ্কালসার ছিল না, তাহার শাখা-প্রশাখা ঘন সবুজ পাতার ভারে আনত ছিল, তাহার স্নিগ্ধ ছায়ায় পারাপারের খেয়াঘাট ছিল। তখন শরৎ কি শীত, কি বসন্তকাল মনে পড়িল না. সে প্রভাতে আকাশের আলো আরও নির্ম্মল, আরও উজ্জল ছিল, বাতাসের স্পর্শ আরও মধুর ছিল, প্রকৃতির শোভায় কোথাও বিষণ্ণতা ছিল না। সে আকাশ,সে আলো কোথায় গেল ? এ জীবনে আর কি তাহার দেখা মিলিবে না ?

ওই শূন্য মাঠে হাট বসিয়াছিল, এই বিজন নদীতীর বিপণি-নৌকায় ভরা ছিল, নদী এত স্ফীত, এত প্রশান্ত ছিল না, কিন্তু সুকুমারের মানস-নদী ছিল কূলে কূলে ভরা।

সতীশ ও সুকুমার তীরে নামিতেই এক বালিকাকণ্ঠে "দাদা" আহ্বানধ্বনি তাহাদের কানে আসিয়া পৌছিল, কিন্তু সুমিষ্ট আহ্বানকারিণীকে কোথাও দেখা গেল না। সতীশ হাসিয়া বলিল, ও মালতী, কোথায় নিশ্চয় লুকিয়ে আছে, বটগাছের পেছনে হবে। মাল্‌তি !

বটগাছের পেছন হইতে এক কিশোরী হাসিয়া ছুটিয়া আসিয়া "দাদা" বলিয়া সতীশকে প্রণাম করিল। সতীশ তাহাকে একটু আদর করিয়া বলিল, ইনি আমার বন্ধু সুকুমার, মস্ত কবি। মালতী মুগ্ধ চোখে সুকুমারের দিকে চাহিল, সদ্য-ফোটা শেফালির মত স্নিগ্ধ চাহনি। দাদার বন্ধুকেও প্রণাম করা উচিত ভাবিয়া সুকুমারকে প্রণাম করিতে আসিল। না, না, কর কি?—বলিয়া সুকুমার একটু পেছনে সরিয়া গিয়া মালতীর হাত ধরিল, মালতী ঘাড় হেঁট করিয়া কোনও মতে প্রণাম সারিয়া লইল। তাহার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল।

—দাদা শীগ্‌গির চল, মাসীমা বড় ভাবছেন, তোমাদের কাল সন্ধ্যেতে আসবার কথা ছিল, মাসী সারা রাত ঘুমোন নি—

সতীশ বলিল, বা, আমরা যে কাল তীরনের বিলে পথ হারিয়ে সারারাত ঘুরেছি—চল্, তোর জন্যে ভাল শাড়ী আর ছবির বই এনেছি।

তিনজনে গ্রাম্যপথ দিয়া চলিল। মধ্যে সতীশ, এক পার্শ্বে সুকুমার, অপর পার্শ্বে মালতী। মালতী সতীশকে বাড়ীর ও গ্রামের নানা সংবাদ বলিতে বলিতে চলিল, তাহার সুমিষ্ট কুমারী-কণ্ঠে সরল হাস্যলহরী চারিদিকে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সুকুমার নীরব-মুখে মালতীর কণ্ঠস্বর বাক্যধারা শুনিতেছিল, বাঙ্‌লাভাষা যে এত সহজ, এত মিষ্ট হইতে পারে, তাহা সে কোনও দিন ভাবে নাই।

মালতীর কথা সে সতীশের নিকট বহুবার শুনিয়াছে। পিতৃ-মাতৃহীনা এই বালিকা সতীশের মাসতুতো বোন। সতীশের মা'র কোনও কন্যা-সন্তান নাই, তিনি মালতীকে আপন কন্যার অধিক

যত্নে রাখিয়াছেন। সতীশের ইচ্ছা মালতীকে কলিকাতায় আনিয়া স্কুলে পড়ায়। কিন্তু সতীশের মাতা কলিকাতায় আসিয়া থাকিতে চান না, গ্রামের জমিজমা দেখিবার ভার নায়েব মহাশয়ের হাতে দিতে তিনি নারাজ। একবার তিনি কলিকাতায় আসিয়া থাকিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এই বদ্ধ নগরে ক্ষুদ্র বাড়ীর মধ্যে দু'দিনেই হাঁপাইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি অল্পবয়সে বিধবা হইয়াছেন, সতীশ তাঁহার একমাত্র পুত্র; আপন বুদ্ধি-পরিশ্রমে ক্ষুদ্র জমিদারীর পরিচালনা করিয়া তিনি সতীশকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন। মালতীও সতীশের মা'কে ছাড়িয়া থাকিতে চায় না, সেজন্য কলিকাতায় আসিয়া তাহার শিক্ষালাভ হইল না। সে গ্রামের স্কুলে কিছুদিন পড়িয়াছে, তারপর সতীশ যখন ছুটিতে যায় তাহাকে পড়াইতে বসে; বই পড়া বিশেষ হয় না, নানা গল্পে সে দেশের বিজ্ঞানের নানা কথা তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করে।

মালতীকে সুকুমারের অপূর্ব্ব বোধ হইল। ডুরে শাড়ীপরা, কোঁক্‌ড়া চুল পিঠে দুলিতেছে, আয়ত কৃষ্ণ চক্ষু দু'টিতে স্নিগ্ধ সরলতা, সহজ হাসি মাখান; সুস্থ দীর্ঘ তনু বিকশিত, সদ্য-প্রস্ফুটিত মৃণালের মত, কিন্তু মুখখানি অতি কচি; শ্যামবর্ণ, এই শরতের শ্যামশ্রীর মধ্যে গৌরবর্ণ মানায় না, তাহার শ্যামবর্ণ-ই সব চেয়ে সুন্দর দেখায়; বালিকার চঞ্চলতা তাহার চক্ষের নাচনে, দেহের ভঙ্গীতে; নিষ্কলুষ চিত্তের স্বচ্ছতা সরল সুকুমার মুখে প্রকাশিত। বিকচোন্মুখ কুঁড়ির ওপর ভৃঙ্গের মত তাহার কিশোরী তনুতে যৌবন আসিয়া বসিয়াছে, তাহার অন্তরবাসিনী সে সংবাদ এখনও জানে না।

গ্রাম ছাড়াইয়া তাহারা অবারিত মাঠের মধ্যে আসিয়া পড়িল ; যতদূর চক্ষু যায় সোনালী ধানের ক্ষেত, হরিতে হিরণে সবুজে সুনীলে কি অপরূপ শোভা ! ক্ষেতের মধ্য দিয়া একটি পায়-হাঁটা পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে, এই পথ দিয়া সতীশের বাড়ী যাইতে হইবে। চারিদিকে সতীশদের জমি, কয়েক শত বিঘা।

—হুজুর ওদিকে পথ নেই, নন্দিগ্রাম যাবার পথ এদিকে—

যেন স্বপ্ন হইতে জাগিয়া চমকিয়া সুকুমার চাহিল। সম্মুখে তক্‌মা-ধারী দুই পেয়াদা, চারিদিকে শূন্য প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে, কোথাও ধানকাটা হইয়া গিয়াছে, কোথাও পোড়ো জমি, কোথাও জল জমিয়া পানায় ভরিয়া গিয়াছে। ডেপুটি-জীবনের মূর্ত্তিমান সাক্ষ্যস্বরূপ পেয়াদা-দুইটি আবার বলিয়া উঠিল, হুজুর পথ এদিকে, ওদিকে মাঠের মধ্যে কোথায় যাবেন ?

সুকুমার গম্ভীরস্বরে বলিল, রায়দের বাড়ী যাবার পথ কোন দিকে হবে ?

স্থানীয় পেয়াদাটি উত্তর দিল, কোনও পথ নেই হুজুর, আলে আলে যেতে হবে। তাঁদের ত কেউ নেই হুজুর, বাড়ী ভেঙে পড়েছে, সব জঙ্গল হয়ে গেছে।

সুকুমার বলিল, আচ্ছা, তোমরা যাও। আজ আর নন্দিগ্রামে যাওয়া হবে না, তোমরা ফিরে যাও, আমার এদিকে একটু কাজ আছে।

পেয়াদারা অতি বিস্মিত হইয়া সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

কাদা ভাঙিয়া, আল পার হইয়া, কাশবনের পাশ দিয়া,

বাঁশবনের মধ্য দিয়া জঙ্গলময় বাগানে ঢুকিয়া সুকুমার এক ভগ্ন অট্টালিকার সন্ধানে চলিল। মাথা হইতে টুপি দুইবার পড়িয়া গেল, জামা দু'জায়গায় ছিঁড়িয়া গেল, হাত পা ক্ষত বিক্ষত হইতেছে, সেদিকে তাহার লক্ষ্য নাই। তাহার মনে হইল, তাহার সহিত সতীশ ও মালতী হাসিয়া গল্প করিতে করিতে চলিয়াছে।

মালতী বলিল, দেখ দাদা, কি সুন্দর ধান হয়েছে।

সতীশ উত্তর দিল, মা খুব খুসি!

—হাঁ দাদা, মাসীমা তিনটে নূতন গোলা করেছেন; জানো দাদা, কাল দয়ের ওদিকে কাদাখোঁচা পাখী দেখেছি, তোমার বন্ধু বন্দুক ছুঁড়তে জানেন?

—বন্দুক ত একটি এনেছেন, কি শিকার করেন দেখা যাক।

—জানো দাদা, কালিগ্রামে বাঘ বেরিয়েছে, আহা পরশু দু'টো বাছুর নিয়ে গেছে না কি, তোমার বন্ধুকে বাঘ শিকার করতে নিয়ে যাও।

—ওরে বুড়ি, উনি কবি যে, উনি কি এখানে বাঘ শিকার করতে এসেছেন, উনি এসেছেন প্রকৃতির শোভা দেখতে,—গাছ, ফুল, পাখী চিনতে, পাড়াগাঁয়ে চাষারা কেমন থাকে তাই জানতে।

—দাদা, এবার কিন্তু আমাদের কপির চাষ করতে হবে।

আম-জাম-বাগান ভরিয়া বাতাস মর্ম্মরিত হইয়া উঠিল। মালতীর সরল হাস্যোচ্ছ্বাস সুকুমারের কানে বাজিতে লাগিল।

৩

কোথায় সেই দহ? দহটি প্রথম দেখিয়া সুকুমার চমৎকৃত হইয়াছিল। চার মাইল লম্বা ও প্রায় এক মাইল চওড়া এই দহ হ্রদের মত মনে হয়। সতীশের পিতা এই দহের তীরে পৈতৃক পুরাতন বাড়ী ভাঙ্গিয়া প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

বৃহৎ ভগ্ন অট্টালিকার সম্মুখে সুকুমার আসিয়া দাঁড়াইল। দরজা-জানালার পাল্লাগুলি কে খুলিয়া লইয়া গিয়াছে, সম্মুখের বারান্দা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, দেওয়ালে বহুস্থানে বালি খসা, একদিকের ছাদ নীচু হইয়া বাড়ীটি যেন হেলিয়া গিয়াছে, নানা বন্যলতা বাড়ীর সর্ব্বাঙ্গ জড়াইয়া উঠিয়াছে, চারিদিকে খেজুর নারিকেল গাছের ভিড়।

জলাভূমি; সেই দিগন্তবিসারী নির্ম্মল দহ আর নাই। শোলা, কলমী, কচুরী পানা, চেঁচো ঘাসে বদ্ধ জলা। তীরের নিকট কোথাও বা লাল সাদা নানা রং-এর শাপলা ফুল। কাকচক্ষু অগাধ জলরাশি গলিত রজতধারার মত টলমল করিত, সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্তে তাহাতে রং-এর হোলিখেলা হইত, মেঘের ছায়া পড়িত, চাঁদের মায়া ঘনাইত, অন্ধকার রাত্রে দর্পণের মত চকমক করিয়া উঠিত। কোথায় সেই দহ?

ভাঙা ঘাটে এক পাথরের উপর সুকুমার বসিয়া পড়িল। তাহার যেন আর দাঁড়াইবার শক্তি নাই। ঘাটের বাঁধানো বসিবার

স্থান অশ্বত্থমূলবিদারিত। চারিদিকে প্রাচীন শাখাবহুল বৃক্ষগুলি আন্দোলিত করিয়া হা হা করিয়া বাতাস বহিয়া গেল! সম্মুখে সবুজের পঙ্কিল আস্তরণের মধ্যে একটু জল রৌদ্রে ঝিকমিক করিতেছে, অশ্রুভরা নয়নের মত করুণ।

স্বপ্নছবির পর ছবি ভাসিয়া উঠিল। কোন্ পূর্ব্ব সুখ-জীবনের কথা। বহু বৎসর পূর্ব্বে সতীশ ও মালতীর সহিত কাটানো এই দহের ধারের দিনরাতগুলি। গল্পের একটানা সূতায় সে-কথা সে ভাবিতে পারিল না, বেদনার টানে সূতা বার বার ছিঁড়িয়া গেল। স্মৃতি কথক নহে, সে চিত্রশিল্পী, চিরপ্রবহমান জীবন হইতে কয়েকটি দৃশ্য বাছিয়া সে ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছে। সুকুমারের মনে পড়িল খণ্ড খণ্ড ঘটনা।

কলিকাতায় কখনও সে ভোরে উঠিত না। কিন্তু সতীশদের গ্রামে আসিয়া প্রতিদিন সে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে উঠিত। দহের ধার দিয়া শিশির-ভেজা ঘাসের উপর বহুদূর চলিয়া যাইত, তাল নারিকেল পত্রগুলির মধ্য দিয়া সূর্য্যোদয় দেখিতে বড় ভাল লাগিত। এক উষায় জাগিয়া দেখিল, সতীশ তখনও ঘুমাইতেছে, তাহাকে জাগাইল না, একা ঘর হইতে বাহির হইল। চারিদিক্ তখনও ছায়াভরা, প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণে ধানের গোলাগুলি পার হইয়া সে গোয়াল ঘরের সম্মুখে আসিয়া পড়িল। পরিচ্ছন্ন বৃহৎ গোয়াল ঘর, তাহার আঙ্গিনাতে এক পরিতৃপ্ত, পরিপুষ্ট গাভীর পার্শ্বে মালতীর স্নিগ্ধ মূর্ত্তি, আবছায়ায় রহস্যময়। সুকুমার পা টিপিয়া গাভীর দিকে অগ্রসর হইল। তরল অন্ধকারে অজানা মানবমূর্ত্তি দেখিয়া

গাভীটি ভীত হইয়া লাফাইয়া উঠিল, তাহার পায়ের আঘাতে দুধে-ভরা এক পিতলের বাল্‌তি উল্টাইয়া পড়িল। মালতী চেঁচাইয়া উঠিল, পুঁটি কি করলি! তারপর সুকুমারকে দেখিয়া উচ্চহাস্যে বলিয়া উঠিল, ও আপনি! বেশ! চোরের মত আসছেন কেন, আপনার জন্যে কি হ'ল দেখলেন?

সুকুমার বিস্মিত হইয়া বলিল, আমার জন্যে?

মালতী উত্তর দিল, বা, আপনাকে দে'খে ভয় পেয়েই পুঁটু বাল্‌তি ওল্টালে। তা বেশ, মাসীমা বলেছিলেন, আপনার জন্যে ক্ষীর-কমলা আর চন্দ্রপুলী করবেন, তা আর খেতে পেলেন না।

সুকুমার লজ্জিত হইল। বলিল, দেখ, মাসীমাকে ব'লো না, তুমি গাঁ থেকে কিছু দুধ আনবার ব্যবস্থা কর। মালতী কলহাস্য করিয়া উঠিল, আচ্ছা আচ্ছা, আপনার দুধের কথা ভাবতে হবে না। তাহার সরল হাসির মত সুন্দর, শুভ্র ফেনময় দুগ্ধস্রোত গোষ্ঠপ্রাঙ্গণে প্রবাহিত হইয়া গেল। গাভী পুঁটু মালতীর হস্তের একটি মৃদু চপেটাঘাত লাভ করিল।

সুকুমার দহের তীরে আসিয়া বসিল, শুকতারার দপ্‌দপানি, ঊষার আলো, জলের শীতল অতলতা তাহার বড় মধুর লাগিল।

একদিন প্রভাতে মালতী আসিয়া সতীশকে বলিল, দাদা, আজ দয়ে সাঁতার কাটবে চল; তোমার বন্ধু সাঁতার কাটতে জানেন?

সুকুমারের সাঁতার-শিক্ষা কলিকাতায়, গোলদীঘির সুইমিং ক্লাবের সে এক উৎসাহী সভ্য।

তিনজনে মিলিয়া সাঁতার কাটিতে চলিল। সতীশের মাতা মালতীর এত দুরন্তপনা পছন্দ করিতেন না, কিন্তু সতীশ তাহাকে প্রশ্রয় দিত বলিয়া তিনি বাধা দিতে পারিতেন না।

গাছ হইতে জলে লাফাইয়া পড়া, জল ছোঁড়াছুঁড়ি, মাতামাতি, ডুব-সাঁতার -- সে কি সহজ সুখ!

তিনজনে সাঁতার-প্রতিযোগিতা। সুকুমার বেশী দূর যাইতে পারিল না, দহের জল যেন ভারী। সতীশ ইচ্ছা করিয়াই, অতি পরিশ্রান্ত, এরূপ ভাব দেখাইল। প্রতিযোগিতায় জিতিয়া মালতীর কি হাসি, কি আনন্দ! বহুদূর সাঁতার কাটিয়া গিয়া তিনজনে যখন দহের তীরে বিশ্রাম করিতে বসিল, সুকুমার মুগ্ধনেত্রে দেখিল, মালতীর জলে-ভেজা কালোচুলে সূর্য্যালোকের ঝল-মলানি, হাস্যদীপ্ত আননে অধরে স্নাততনুর রেখায় রেখায় আলোক-লীলা। যেন কোন স্বপ্নময়ী নাগবালা সূর্য্যহসিত জলরাশির অতলতা হইতে উঠিয়া আসিয়াছে।

—

বিজন স্তব্ধ মধ্যাহ্ন; দহের স্থির জলে শুভ্র মেঘস্তূপের ছায়া, বাঁশবন তালবনের ছায়া।

সুকুমার এক গাছের তলায় বসিয়া একটি ইংরেজি কবিতার বই পড়িতে চেষ্টা করিতেছিল। গাছের ওপর হইতে একটি পেয়ারা তার বই-এর ওপর আসিয়া পড়িল। সে উপরে চাহিয়া দেখিল, গাছের পাতার আড়ালে মালতী লুকাইয়া। ধীরে সে গাছে উঠিতে চেষ্টা করিল, মালতী গাছ হইতে লাফাইয়া পালাইতে গেল, সুকুমার তাহার পেছন ছুটিল, আম-বাগানে দু'জনে ছুটাছুটি পড়িয়া

গেল। লাফাইয়া পড়িতে গিয়া মালতীর পা একটু মচকাইয়া গিয়াছিল, সুকুমার সহজে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, তাহার কোমল হাত দৃঢ় করিয়াই ধরিল। মালতী হাসিয়া চেঁচাইল, উঃ, লাগছে ছেড়ে দিন। তাহার সমস্ত মুখ আরক্ত। সুকুমার আরও দৃঢ় করিয়া দুই হাত ধরিল। সহসা মালতী কাঁদিয়া ফেলিল; তাহার সত্যই লাগিতেছিল। সুকুমার হাত ছাড়িয়া হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ধীরে বলিল, মালতী, আমায় ক্ষমা কর।

লজ্জায় কান্না চাপিয়া মালতী চলিয়া গেল। সুকুমারের চোখে প্রখরালোকদীপ্ত পৃথিবী বড় শূন্য মনে হইল। সে আনমনা গাছতলায় বসিয়া পড়িল।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে মালতী এক শালপাতার ঠোঙাতে অপরিমিত লঙ্কা-লবণ মিশ্রিত আমের আচার লইয়া আসিয়া যখন বলিল, খাবেন? লঙ্কা খাওয়া অভ্যাস না থাকিলেও সে হাসিমুখে 'উঃ' 'আঃ' করিয়া সমস্ত আচার শেষ করিল।

সে-সন্ধ্যাটি সে জীবনে ভুলিতে পারিবে না। ঘর অন্ধকার, বারান্দায় বসিয়া সে সূর্য্যাস্ত দেখিতেছিল। পূর্ব্বাকাশ কালো মেঘে ছাওয়া, পশ্চিমাকাশের মেঘস্তূপে রঙের সঙ্গে রঙের ঠেলাঠেলি, দহের জল গলিত স্বর্ণের মত।

সুকুমার দেখিল, অদূরে অঙ্গন দিয়া মালতী প্রদীপ হস্তে চলিয়াছে, তুলসীতলায় সন্ধ্যা দিয়া যাইতেছে, দেবী প্রতিমার মত মুখখানি প্রদীপের শিখায় উদ্ভাসিত, কি স্নিগ্ধ, কি অপরূপ!

তাহার ইচ্ছা হইল, সে বলিয়া ওঠে, মালতী, আমার গৃহ

অন্ধকার, ওই প্রদীপ হস্তে তুমি আমার গৃহে এসো, ওই মঙ্গলস্নিগ্ধ শিখায় আমার জীবন আলোকিত করিয়া তোল।

সুকুমারের যৌবন-হৃদয়ের যে বিজন গৃহে জীবন-প্রিয়ার জন্য আসন পাতা হইয়াছে, প্রেমারতির প্রদীপ অনাগতার প্রতীক্ষায় নীরবে জ্বলিতেছে, সে গৃহে মালতী কখন নিঃশব্দ চরণে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা সে জানিতে পারে নাই। সে সন্ধ্যায় প্রেম-প্রদীপ জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল।

আর একটি দ্বিপ্রহর, নিঝুম উদাস আলোয় দিবা-স্বপ্নের জাল বোনা যায়।

জমিদারীর কোনও মোকদ্দমা তদারকের জন্য সতীশকে সহরে যাইতে হইয়াছে, সেখানে কয়েকদিন থাকিতে হইবে। তা ছাড়া মালতীর জন্য এক সৎ-পাত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, কোন উকীলের পুত্র। তাহাকেও দেখিয়া সব খোঁজ-খবর লইয়া আসিবে।

সুকুমার এক কদমগাছের তলায় বসিয়া টুর্গনিভের 'অন্ দি ইভ' বইখানি পড়িতেছিল। বইখানি তাহার দুইবার পড়া, আর-একবার পড়িতে চেষ্টা করিয়া আনমনা হইয়া উঠিতেছিল। মালতী সহাস্যে আসিয়া বলিল, বা, বেশ, সারাক্ষণ নিজে নিজে বই পড়ছেন, আমায় ত একটু পড়ান না?

—শুনবে এই বইয়ের গল্প?

—বলুন, নিশ্চয় শুনব। মালতী চুল এলাইয়া গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া পা ছড়াইয়া বসিল।

সুকুমার টুর্গনিভের উপন্যাসের গল্পটি বলিয়া যাইতে লাগিল। তরুশ্রেণীর মর্ম্মরে, মক্ষিকাদলের গুঞ্জরণে, দিগন্তে পুঞ্জিত সবুজের স্তব্ধতায়, দহের জলের ঝিকিমিকিতে, বাঁশের পাতায় আলোর কম্পনে, মালতীর স্নিগ্ধ কালো চোখের চাওয়ায় দিবস আরও মধুর, আরও উদাস হইয়া উঠিল।

সুকুমার যখন গল্প শেষ করিল, করুণ-কাহিনী শুনিয়া মালতীর চোখ ছলছল করিয়া উঠিয়াছে। মালতীকে বড় সুন্দর দেখাইল।

সুকুমার মালতীর হাত নিজ হাতে টানিয়া লইল। মালতী বাধা দিল না; শ্যাম চিত্রপটে ছবির মত বসিয়া রহিল।

সুকুমার ধীরে বলিল, মালতি, তোমাকে আমি ভালবাসি। যেন টুর্গনিভের গল্পের উপসংহারে নিজ জীবনের গল্প বলিতেছে।

মালতী যেন স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিল, হাত টানিয়া লইল, আয়ত কালো চোখ-দু'টি আরও কাল হইয়া উঠিল।

সুকুমার বলিল, শোন মালতি, আমায় তুমি বিয়ে করবে, কেমন রাজী?

মালতী আবার স্বপ্নাবিষ্ট হইয়া গেল!

সুকুমার বলিল, কি, মৌনং সম্মতি লক্ষণং?

মালতী মায়াময় হাসিয়া বলিল, তার মানে?

সুকুমার বলিল, তার মানে হচ্ছে, তুমি রাজী ব'লেই চুপ করে আছ।

মালতী উচ্চহাস্যে বলিল, বা, আমি কি জানি?

সুকুমার বলিল, তুমি জানো।

এবার মালতী গম্ভীর হইল, ধীরে বলিল, সত্যি বলছেন?

সুকুমার অস্ফুটস্বরে বলিল, হাঁ সত্যি।

মালতীর মুখ রাঙা হইল। সে বলিল, বেশ, তা'হলে দাদাকে, মাসীমাকে বলুন।

সুকুমার বলিল, তোমার দাদা আসুন।

মালতী নিমেষে উঠিয়া অন্তর্হিত হইল। জলে নীলাকাশের ছায়ার দিকে চাহিয়া সুকুমার বসিয়া রহিল।

তারপর দুইদিন মালতীর বিশেষ দেখা পাওয়া গেল না। ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়া সে পালায়।

সুকুমার দেখিল, তাহার হাস্য মৃদু, তাহার গমন মন্থর, তাহার দৃষ্টি গভীর হইয়াছে। কোন গম্ভীর স্নিগ্ধ নারীপ্রকৃতি চঞ্চলা সরলা বালিকার দেহে মনে ধীরে ভরিয়া উঠিতেছে। কখন যাদুমন্ত্রে তাহার বালিকা-জীবন শেষ হইয়া নারী-জীবন আরম্ভ হইল, সে জানিতে পারিল না।

তৃতীয় দিন মালতী ধরা দিল।

রাত্রে চাঁদ উঠিয়াছে চমৎকার। দহের ঘাটে সুকুমার বসিয়াছিল চুপ করিয়া, এ কোন রূপকথার মায়াপুরী।

মালতী আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, নৌকো চালাবেন? ঘাটে একটি দুই দাঁড় নৌকা বাঁধা।

দুইজনে নীরবে নৌকায় গিয়া উঠিল, অতি মৃদুভাবে দাঁড় টানিয়া চলিল, জলের ছপ্‌ ছপ্‌ শব্দে জ্যোৎস্না রাত্রি শিহরিত হইয়া উঠিল।

দুইধারে মায়াময় বৃক্ষশ্রেণীর মর্ম্মরিত অন্ধকার, সম্মুখে রজতশুভ্র

টলমল জলপথ, ঊর্দ্ধে স্তব্ধ নীলাকাশ জ্যোৎস্নাধৌত। কয়েকটি সামান্য কথা, মাঝে মাঝে হাসি, দাঁড় ছাড়িয়া এলাইয়া বসা।

পদ্মবনে তাহারা নৌকা থামাইয়া বহুক্ষণ বসিয়া রহিল। চেঁচাইয়া কথা কহিতে পারিল না, সহাস্য মৃদু গুঞ্জরণ।

গভীর রাত্রিতে যখন তাহারা বাড়ী ফিরিল, তাহাদের দেহমন কোন অতল সুধারসে কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে!

পরদিন অপরাহ্ণে সুকুমারের বাড়ী হইতে টেলিগ্রাম আসিল। সুকুমার তাহার প্রিয় গাছের তলায় বসিয়াছিল, বোধ-হয় মালতীর প্রতীক্ষা করিতেছিল। চতুর্দ্দিকে যে প্রাণ-ধারা মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠিয়াছে, শাখায় শাখায় আলোকের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে, এই পল্লবিত পুষ্পিত প্রাণোচ্ছ্বাসের স্পন্দন আপন অন্তরে অনুভব করিতেছিল।

টেলিগ্রাম লইয়া আসিলেন সতীশের মা। উৎকণ্ঠিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কোনও দুঃসংবাদ নয় ত?

সুকুমার ভীতস্বরে বলিল, মা'র বড় অসুখ, আমায় আজই যেতে হবে। তাঁর হার্ট্ খারাপ, বাড়াবাড়ি হয়েছে।

সতীশ সহর হইতে ফিরিয়া আসে নাই। তাহার জন্য প্রতীক্ষা করা চলিবে না। সতীশের মাতা সুকুমারের কলিকাতা যাইবার সব বন্দোবস্ত করিতে চলিলেন। সন্ধ্যার সময় নৌকায় বাহির হইলে ভোরে ট্রেন পাওয়া যাইতে পারে।

সতীশের মাকে প্রণাম করিয়া সুকুমার যখন তাহার হাত-ব্যাগ লইতে সন্ধ্যার আলোছায়াময় গৃহে প্রবেশ করিল, দেখিল, মালতী

ভূমিতে নতজানু হইয়া তাহার বিছানাতে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতেছে। ধীরে সে মালতীর হাত ধরিল, মাথায় হাত বুলাইল, মালতী কাঁপিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, তাহার বুকে মুখ গুঁজিল, দুই চক্ষু দিয়া দুই কপোল বহিয়া অশ্রু অঝোরে ঝরিতে লাগিল। এই চিরহাস্যময়ীর ক্রন্দন সুকুমার বেশীক্ষণ সহ্য করিতে পারিল না, তাহার বুক বুঝি ভাঙ্গিয়া যাইবে। সে শুধু বলিল, মালতি, কেঁদো না, আমি গিয়েই চিঠি দেব।

মাঝিরা যখন নৌকা ছাড়িয়া দিল, সূর্য্যের স্বর্ণরেখা মিলাইয়া গিয়াছে, আকাশ তারায় তারায় ভরা। সুকুমার ব্যথিত ক্ষুধিত চোখে তটভূমির দিকে চাহিয়া রহিল, বটবৃক্ষের অন্তরালে কে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে, মনে হইল। সে মালতী।

তটভূমি ছায়ার মত মিলাইয়া গেল, চারিদিকে সজল গম্ভীর অন্ধকার নিবিড় হইয়া আসিল।

তারপর ?

তারপরের দিনগুলির কথা সুকুমারের ভাবিতে ইচ্ছা হইল না। কিন্তু স্মৃতির ধারা মুক্তি পাইয়া অদম্য স্রোতে প্রবাহিত, কে তাহার গতি রোধ করিতে পারে !

কলিকাতায় ফিরিয়া সুকুমার দেখিল, মা সারিয়া উঠিয়াছেন, একদিন অসুখ একটু বাড়িয়াছিল, সেজন্য টেলিগ্রাম করা হইয়াছিল। সতীশকে সে চিঠি লিখিল কিন্তু তাহাতে মালতীর সহিত বিবাহ সম্বন্ধে কিছুই লিখিল না। মালতীকে একটি ছোট চিঠি লিখিবে ভাবিল, কোনও কথা খুঁজিয়া পাইল না।

মালতী যেন কোনও গ্রাম্য রূপকথার স্বপ্ন। নদীর তীরে, আম্রবনের ছায়ায়, গোলাভরা গোষ্ঠপ্রাঙ্গণে, দহের পদ্মবনে, চন্দ্রালোকের মায়ায় তাহাকে মানায়; কলিকাতার কৃত্রিম সভ্য-জীবনে অর্থগর্ব্বিত সমাজে তাহার স্থান কোথায়? সুকুমার বুঝিল, মালতীকে তাহার জীবন-সঙ্গিনী করা অসম্ভব। সে যদি কোনও চরের ধারে নিভৃত শান্ত পল্লীতে জীবন যাপন করিত, তাহা হইলে মালতীকে বিবাহ করিয়া সুখী হইত।

এদিকে সুকুমারের অসুস্থা মাতা অতি শীঘ্র পুত্রবধূর মুখদর্শনের জন্য ব্যাকুলা হইয়া উঠিলেন। এ বিষয়ে তাঁহাকে উৎসাহিত করিবার লোকের অভাব ছিল না।

মনোরমার পিতা সুকুমারের পিতৃবন্ধু; মেয়েটিকে মায়েরও পছন্দ; তাহার ভ্রাতা সুকুমারের স্কুল-কলেজের সহপাঠী। পিতৃবন্ধু স্বয়ং আসিয়া যখন প্রায়ই সুকুমারকে চায়ে বা রাতের ডিনারে নিমন্ত্রণ করিয়া যাইতে লাগিলেন, সুকুমার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। মনোরমাদের বাড়ীর টেনিস-ক্লাবে সে নিয়মিত সভ্য হইয়া উঠিল। কিছুদিন পর দেখিল, মনোরমার হাতে-তৈরী চা'র একটা অপূর্ব্ব মিষ্টতা আছে ও মনোরমাও বিশেষ 'চার্মিং'; সাধারণ মেয়েদের মত সে নয়।

বিকালবেলা টেনিস্-র‍্যাকেট ঘোরাইতে ঘোরাইতে সুকুমার বালীগঞ্জের দিকে যাইতেছিল, পথে সতীশকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইল। সতীশের মুখ মলিন, চুল উস্কখুস্ক।

সতীশ একটু কর্কশ স্বরেই বলিল, বেশ তোমায় তিনখানা চিঠি দিলুম, কোনও উত্তর নেই, তোমার বাড়ীর দিকেই যাচ্ছিলুম।

সুকুমার লজ্জিত হইয়া বলিল, বড় অন্যায় হয়ে গেছে ; কবে এলে ? মায়ের অসুখে—

সতীশ দৃঢ়স্বরে বলিল, শোন, মা ও মালতীকে নিয়ে এসেছি, আমার সেই পুরানো ঠিকানা—

—ওঁরা এসেছেন ?

—হাঁ, মালতীর যে কি অসুখ করেছে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না —তুমি চলে আসার পর থেকেই—যেমন রোগা তেম্নি দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে—বলে, বুকের মধ্যে কি রকম একটা ব্যথা করে, মাঝে মাঝে একা ছাদে গিয়ে কাঁদে—বলে খানিকটা কাঁদলে বুকের ব্যথাটা কমে—

হঠাৎ কি অসুখ—সুকুমার আর বলিতে পারিল না, কোনও রকমে আপনাকে সংযত করিয়া রাখিল।

—মা বললেন, চল কলকাতায়, ডাক্তারদের দেখাই, কি যে হয়েছে, মেয়েটা মুখ ফুটে বলে না, কেঁদে কেঁদেই কি প্রাণটা দেবে! তাই নিয়ে এসেছি কলকাতায়। দু' তিনজন ভাল ডাক্তার দেখালুম, সবাই বলে, মনের অসুখ। জান ত, ওর কি কচি মন ; ওর কষ্ট দে'খে আমার রাতে ঘুম হয় না—কি যে ওর ব্যথা, কিছু মুখ ফুটে বলে না—র‍্যাকেটটা যে তোমার হাত থেকে প'ড়ে গেল—

সুকুমার কোনও উত্তর করিল না।

—শোন, আজ সন্ধ্যেতে এসো, মা তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে চান—তোমার কথা রোজই বলছেন—

—দেখ ভাই, আজ আমার একটা বিশেষ 'এন্‌গেজ-মেণ্ট' রয়েছে, আমি কাল যাব—

—আচ্ছা, কাল নিশ্চয় এসো, আমি সারাদিন বাড়ী থাকব।

বালীগঞ্জ যাইতে সুকুমারের আর ইচ্ছা করিল না, কিন্তু কে যেন তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল। দুইদিন হইল মনোরমার সহিত তাহার 'এন্‌গেজমেণ্ট্' হইয়া গিয়াছে।

পরদিন সতীশের বাড়ী যাওয়া হইল না। চন্দননগরে গঙ্গার ধারে এক সুন্দর বাগান পাওয়া গিয়াছে, পিক্‌নিকের ব্যবস্থা হইয়াছে। বহু প্রতিবাদ সত্ত্বেও সুকুমারকে মনোরমাদের সঙ্গে যাইতে হইল।

তার পরদিন টেনিস-টুর্ণামেণ্ট আরম্ভ; প্রথম খেলাতেই সুকুমার।

সত্যই কি সে একটু সময় করিয়া মালতীকে দেখিতে যাইতে পারিত না?

দিনের পর দিন আপনাকে নানা কাজে অকাজে জড়াইয়া সে মনকে বোঝাইতেছিল, তাহার সময় নাই।

ভাবী শ্বশুরের সুপারিশে গবর্ণমেণ্ট-চাকরির চেষ্টা চলিতেছিল। বঙ্গ-গবর্ণমেণ্টের কয়েকজন উচ্চতন ইংরেজ কর্ম্মচারীর সহিত দেখা করা বিশেষ আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, সে দার্জ্জিলিং চলিয়া গেল।

সাতদিন পরে যখন সে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল, সতীশ তাহার মা ও বোনকে লইয়া দেশে ফিরিয়া গিয়াছে।

সতীশকে চিঠি লিখিয়া কোনও খবর লইতে সে লজ্জা বোধ করিল।

সংবাদটি কোনও সহপাঠী বন্ধু তাহাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিল। তিন মাস পরে হইবে।

মনোরমার সহিত মহা ধূমধামে তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ডেপুটিগিরি চাকরিও লাভ হইয়াছে।

বাঙলার কোনও ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত সহরে গিয়া সে ম্যালেরিয়াক্রান্ত। অসুখের সংবাদ জানিয়া মনোরমা তাহার পিতার সহিত স্বামীর নব কর্ম্মস্থলে যেদিন আসিল, সেই দিনই সন্ধ্যায় বন্ধুর পত্র আসিল।

অপরাহ্ণে প্রচুর কুইনিন খাইয়া রাগ মুড়ি দিয়া সুকুমার 'সার্কিট-হাউসে'র বারান্দায় বসিয়াছিল। ডাকপিয়ন চিঠি দিয়া গেল। দীর্ঘ পত্রটি দুইবার পড়িল, সব যেন বুঝিতে পারিল না, কুইনিন খাইয়া তাহার মাথা ঝিমঝিম করিতেছে।

শুধু এইটুকু বুঝিল, মালতীর মৃতদেহ দহের জলে পাওয়া গিয়াছে! অন্ধকার রাত্রিতে একটি ছোট নৌকা লইয়া মালতী দহ পার হইতে চেষ্টা করে; দহের মধ্যস্থানে গিয়া তাহার নৌকা উল্টাইয়া যায়। সে অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিল। সে ইচ্ছা করিয়া ডুবিয়াছিল, না, তাহার সাঁতার কাটিবার শক্তি ছিল না, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

সে রাত্রিতে সুকুমারের আবার জ্বর আসিল, জ্বর উঠিল একশ পাঁচ ডিগ্রি; সমস্ত রাত্রি ও পরদিন সে বিকারগ্রস্ত হইয়া ভুল বকিল, 'মালতি' 'মালতি'!

অর্দ্ধসংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিতে হইল চিকিৎসার জন্য।

দুইমাস পরে যখন সে সুস্থ হইয়া উঠিল, সতীশকে দীর্ঘ পত্র লিখিল। কোনও উত্তর আসিল না।

খোঁজ লইয়া জানিল, মালতীর মৃত্যুর সাতদিন পরেই সতীশের মাতার মৃত্যু হইয়াছে। সতীশ তাহার সমস্ত জমিদারী বেচিয়া ব্রেজিলে চলিয়া গিয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকায় জমি কিনিয়া সে বসবাস করিবে। শুধু পৈতৃক বাড়ী ও দহ বৃদ্ধ নায়েবের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া গিয়াছে।

কোথায় সেই দহ? শরতের মধ্যাহ্নালোকপ্লাবিত শৈবালপূর্ণ দহের দিকে চাহিয়া সুকুমার দুই চক্ষের অশ্রু আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না, ছোট শিশুর মত ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

জনহীন জীর্ণ বনানী উদাস বাতাসে মাঝে মাঝে হা হা করিয়া উঠিল।

অতি পরিশ্রান্ত ভাবে সুকুমার যখন বজরাতে ফিরিল, সূর্য্য মধ্যগগন অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। চারিদিকে শুষ্ক প্রখর আলো।

মনোরমা স্বামীকে দেখিয়া উদ্বিগ্নভাবে ছুটিয়া আসিলেন, এতক্ষণ কোথায় ছিলে, পেয়াদারা খুঁজে খুঁজে হায়রান হয়েছে। এ কি, রোদে মুখ কালী হয়ে গেছে, অসুখ করে নি ত?

মনোরমা স্বামীর কপালে মুখে হাত বুলাইয়া বলিলেন, কি ঠাণ্ডা তোমার হাত, গা যেন হিম। শোন, আর স্নান কোরো না, গরম জল ক'রে রেখেছি, হাত মুখ ধুয়ে খেতে এস। মাংসটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল,—

একটু পরে মনোরমা যখন সকল খাবার আনিয়া টেবিলে

রাখিলেন, দেখিলেন স্বামী অতি ক্লান্ত, অতি উদাসভাবে চেয়ারে বসিয়া।

—বা, ওঠ, হাতে মুখে একটু জল দিয়ে এসো। ওগো, দেখ ত মাংসটা কেমন হয়েছে!

একটি ছোট প্লেটে মুরগীর মিঠে কোর্ম্মা আনিয়া মনোরমা স্বামীর সম্মুখে ধরিলেন। সুকুমার এক টুক্‌রা মাংস হতাশভাবে মুখে পুরিল, রান্না আলুনী মনে হইল। লবণহীন মাংসখণ্ড কোনরূপে গিলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার যেন দম আটকাইয়া যাইতেছে।

বেগে বাহিরে গিয়া সে মাঝিদের হুকুম দিল, নোঙর তুলিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিতে।

তক্‌মাধারী পেয়াদাটি বলিল, হুজুর, নন্দিগ্রামে—

সুকুমার ক্ষুব্ধকণ্ঠে হুকুম দিল, দরকার নেই—নোঙর তোল, চল, এগিয়ে চল—

লেখকের বিচার

অবনীর 'ললিত-লাবণ্য' কথা, সিতাংশুর 'বালীগঞ্জে ভূতুড়ে বাড়ি' ও সতীশের 'অনন্ত তৃষ্ণা' গল্পগুলির পর আমার গল্প তোমাদের তেমন ভাল লাগবে না। আমি যা বলব তা গল্প নয়, আমার দৃঢ়বিশ্বাস, এ-ঘটনা ঘটেছিল, অর্থাৎ ঘটা উচিত ছিল।

গত মাসে সতীশ চৌধুরীর বাড়ীতে ডিনার-খাওয়া তোমাদের নিশ্চয় মনে আছে। চৌধুরীর কোনও ডিনার আমি ভুলতে পারি না, ও লোকটা খাওয়ার আর্ট ওস্তাদের মত আয়ত্ত করেছে। যেমন বর্ণ ও রেখা-ছন্দের সামঞ্জস্যে চিত্রের সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয়; যেমন বেহালার সঙ্গে পিয়ানোর বা শরদের সঙ্গে বাঁয়াতবলার যথাযথ সঙ্গতে সুরের সমন্বয়ে জল্‌সা জ'মে ওঠে, তেমনই আহার্য্যের সঙ্গে পানীয়ের যথোচিত সম্মিলনেই আহারের আনন্দসৃষ্টি হয়; ভোজ্য প্রচুর ও বিচিত্র হলেই হয় না; আহার্য্য নির্দ্ধারণে চাই সংযম এবং ডিনারের প্রতি কোর্সের খাদ্যের সঙ্গে পানীয় নির্ব্বাচনে চাই পান-বিলাসীর সূক্ষ্ম আভিজাতিক রুচি; চৌধুরীর প্রতি ডিনারে আহার্য্য ও পানীয়ের শুধু বৈচিত্র্য নয়, আনন্দময় ঐক্য পাওয়া যায় ব'লেই তার ডিনারগুলি এমন উপভোগ্য।

ডিনার খেয়ে যখন বাড়ী ফিরলুম, রাত বারটা বেজে গেছে, কে আমায় মোটরে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে গেল, অবনী তুমিই বোধ

হয়। হাসছ কেন,—বুঝেছি, তুমি বলতে চাও, মোটরে বাড়ী পৌছে না দিয়ে গেলে, একা বাড়ী ফেরবার মত অবস্থা আমার ছিল না, তা হয়ত সত্যি !

আমার ড্রয়িং-রুম তোমরা দেখেছ, বাড়ীর একতলার প্রায় সমস্ত অংশ জুড়ে, তার পাশে বারান্দা, তারপর দোতলাতে ওঠবার সিঁড়ি। সিঁড়িতে উঠতে গিয়ে দেখি, ড্রয়িং-রুমে আলো জ্বলছে ; এত রাত্রে ড্রয়িং-রুমে কে আলো জ্বালাল !

খোলা দরজার পর্দ্দা সরিয়ে দেখি, ঘর লোক-ভরা, সব অজানা অদ্ভুত মূর্ত্তি ! এত রাতে এত লোক আমার জন্যে প্রতীক্ষা করছে আর গেট খোলবার সময় দরোয়ান একটা কথাও বললে না ? ঘরের আলো বড় অপূর্ব্ব লাগল, এ-আলো কলিকাতা ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানীর বৈদ্যুতিক আলো নয়, এ সূর্য্যের বা চন্দ্রের আলোও নয়, এ কোনও অতীন্দ্রিয়-লোকের আলো।

ঘরে প্রবেশ করতেই একটা সোরগোল প'ড়ে গেল।

—এই যে এতক্ষণে এসেছেন।

—খাওয়া বেশ ভালই হয়েছে দেখছি।

—পান ততোধিক, আমরা এদিকে এক ঘণ্টা ব'সে।

বিস্মিত ভাবে বললুম, ক্ষমা করবেন, আমি কাউকে ঠিক চিনতে পারছি না, কোনও জরুরী কেস্ নাকি, পুলিস কেস্ ?

সোফাতে একটি মোটা লোক বসেছিল, সার্কাসের ক্লাউনের মত হা, হা, ক'রে সে অদ্ভুত হেসে উঠল,—ওহে, আমাদের চিনতে পারছে না !

সামনের 'সেটি'তে এক মধ্যবয়স্কা নারী ব'সে, শুষ্ক মুখ, শীর্ণ

দেহ, চোখ দুটি অস্বাভাবিক জ্বলজ্বল করছে। কোণে গদি-আঁটা চেয়ারে এক তরুণ যুবক, কালো কোঁকড়ান চুল, কবির মত স্বপ্নভরা চোখ। রজনীগন্ধা-ভরা ফুলদানির পাশে দোলানো-চেয়ারে এক তরুণী, বর্ষাস্নাত শ্বেতকরবীর মত করুণ সুন্দর। অপর দিকে এক কিশোরী নভ-রঙের শাড়ী প'রে, শ্রাবণ-জ্যোৎস্নায় অপরাজিতা লতার মত মধুর উদাস। আরও অনেক বিচিত্রবেশী বিভিন্ন বয়সের নরনারী। মনে হ'ল, তাদের যেন কোন স্বপ্নে দেখেছি, চেনা হয়েছিল, কিন্তু জানা হয়নি, সব ভুলে গেছি। মোটা লোকটি পরিহাসের সুরে হেসে উঠল,—ভয় নেই, চেয়ারটায় ব'স, 'ভারতী'তে 'ক্লাউন' ব'লে একটি গল্প লিখেছিলে মনে পড়ে?

—হাঁ, সে ত অনেক বছর আগে হবে।

—আমি সেই ক্লাউন, আমার কথাই তুমি লিখে নাম করেছিলে। আমার আসার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু এঁরা, বিশেষ ক'রে ইনি, কিছুতেই ছাড়লেন না।

রঙ্গভরা চোখ নাচিয়ে সে শীর্ণা নারীটির দিকে চাইল।

ক্লাউন বলতে লাগল,—'মা' গল্পটা মনে পড়ে? ইনি সেই মা। তোমার গল্পে এঁর সাত বছরের ছেলে টাইফয়েডে মারা যায়, চার বছর ধ'রে ইনি মৃত ছেলের জন্যে শোক করছেন, প্রতীক্ষা করছেন, এখন এসেছেন তোমার কাছে, তাঁর প্রতি কেন এ অবিচার, কেন তাঁর ছেলে মারা যাবে, তুমি ত তাঁর ছেলেকে বাঁচিয়ে দিতে পারতে। আর এঁরা সব তোমার গল্প-উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা—ওই হচ্ছে বিশু পাগল, কোণে গুম হয়ে ব'সে আছে, ওই তোমার তরুণ কবি রেবন্ত, ওই মাধবী কেশে শ্বেতকরবীর মালা

জড়িয়েছে, ওই চিরবিরহিণী অপরাজিতা—এঁরা এসেছেন তোমার বিচার করতে, তুমি তোমার খুশীমত তাঁদের জীবন গড়েছ, ভেঙেছ, কেন তাঁরা এত দুঃখ পাবেন চিরদিন, তুমি কি ওঁদের সুখী করতে পারতে না? হা, হা, এবার বড় মুস্কিলে পড়েছ, লেখক।

ব্যঙ্গের সুরে সে উচ্চৈস্বরে হেসে উঠল, যেন জীবনটা একটা অট্টহাস্য।

ধীরে বললুম, আমি লেখক মাত্র, মানব-সংসারে যদি দুঃখ, মৃত্যু, বিচ্ছেদ না থাকত, আমিও সে-কথা লিখতুম না, আমার কি অপরাধ?

শীর্ণা নারী ব্যথিত স্বরে ব'লে উঠল, কার কি অপরাধ আমি জানিনা, বুঝি না, আমি চাই আমার ছেলেকে, আমার মাণিককে ফিরিয়ে দাও।

—আমি চাই আমার স্বামীকে। কেন তিনি আমায় ত্যাগ ক'রে চ'লে যাবেন এক ঘৃণিতা নারীর সঙ্গে?

—আমি চাই আমার প্রেমিক, আমার অজিতকে, সে ত সত্যি আমায় ভালবাসত, আমায় বিবাহ করবে বলেছিল, তুমি কি আমার সুখ-মিলন-কথা লিখে তোমার উপন্যাস শেষ করতে পারতে না? কেন তুমি আনলে ইন্দ্রাণীকে, অজিত তার রূপ দে'খে ভুলে গেল, আমাকে ত্যাগ ক'রে চ'লে গেল—আমাদের প্রেম-মিলনপথে তুমি কেন আনলে ইন্দ্রাণীকে?

—আর আমি? হৈমন্তীকে আমার মত কে ভালবাসত, কে ভালবাসে? নিজ হাতে তাকে আমি খুন করলুম, হৈমন্তী শরৎ-শেফালির মত পবিত্র নিষ্পাপ, তাকে আমি সন্দেহ করলুম; কেন

তুমি শরতকে আনলে আমাদের জীবনে ? সে শুধু আমার মনে সন্দেহ জাগাত, নিজ স্ত্রীকে ভাবলুম অবিশ্বাসিনী, তুমি লেখক শরতের চরিত্র এঁকে পেলে বাহবা, আমি হলুম স্ত্রী-হত্যাকারী !

আমি বললুম, দেখ তোমরা যদি একে একে তোমাদের কথা বল, তাহলে তোমাদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করতে পারি।

শীর্ণা নারী ব'লে উঠলেন, আগে আমার উত্তর দাও, কেন আমার ছেলে মরবে, টাইফয়েড রোগ থেকে ত কত ছেলে সেরে ওঠে, তুমি কি গল্পে লিখতে পারতে না, আমার ছেলে সেরে উঠল ?

বললুম, মা, তুমি কি ভাবো, তোমার ছেলের মৃত্যুতে আমার অন্তরের ব্যথা, তোমার ব্যথার চেয়ে কিছু কম ? তুমি জানো, আমিও তোমারই মত তোমার রুগ্নশিশুর শিয়রে রাতের পর রাত ভয়ব্যাকুল চক্ষে জেগেছি ; তুমি জানো, আমিও তোমারই মত তার রোগমুক্তির জন্যে প্রার্থনা করেছি। মনে পড়ে, যে-রাতে তোমার ছেলের মৃত্যু হয়—সন্ধ্যায় ডাক্তার ব'লে গেল, খোকা অনেকটা ভাল আছে, সেই আশ্বাসবাণী শুনে তুমি ভাবলে রাতে একটু ঘুমোবে, শ্রান্তিতে তুমি তার শয্যাপার্শ্বে ঘুমিয়ে পড়লে, আমি কিন্তু বিনিদ্র নয়নে জেগে রইলুম। শ্রাবণের মধ্যরাতে আকাশের সব তারা নিবিয়ে বৃষ্টি এল, দ্বারে দেখলুম, কার করাল কৃষ্ণ ছায়া, সে যম। দ্বার রোধ ক'রে দাঁড়ালুম, বললুম, নিদ্রিত মায়ের কোল থেকে রুগ্ন পুত্রকে তুমি নিতে পারবে না, আমি মাকে জাগিয়ে দেব। যম বললে,—তুমি বাধা দিও না, সৃষ্টির সত্যকে তুমি লঙ্ঘন করতে চাও! আমি যম, আমি অমোঘ শাশ্বত নিয়ম,

আমি আজ্ঞাবহনকারী ভৃত্য মাত্র, আমার কাছে প্রার্থনা করা বৃথা ; যিনি জন্মমৃত্যুর অধিপতি তাঁর কাছে প্রার্থনা কর, কিন্তু সে প্রার্থনাও বৃথা হবে, সৃষ্টিকর্তা নিজ নিয়ম-জালে আপনি বাঁধা পড়েছেন। পারলুম না যমকে বাধা দিতে, নিশীথ রাত্রে তোমার ঘর থেকে সে তোমার ছেলেকে নিয়ে গেল, তুমি নিদ্রিতা ছিলে, ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ শ্রাবণ নিশীথাকাশের মত আমার চোখে অশ্রুর বন্যা উথলে উঠেছিল। তা যদি না হ'ত তা হ'লে পারতুম কি তোমায় সৃষ্টি করতে, তোমার কথা লিখতে কি পারতুম? তোমার মনের বেদনা আমার রেখাঙ্কিত ললাটে আমার শীর্ণ কপোলে ; তোমার আশাহীন কালো চোখের দিকে চেয়ে বিশ্বস্রষ্টাকে আমিও রাতের পর রাত প্রশ্ন করেছি ; উত্তর পেলুম না, কিন্তু শোকাতুরা মাতার দিব্য মূর্ত্তি দেখলুম ; তুমি ছিলে চঞ্চলা বালিকা, নিজ স্বার্থকামিনী, সুখান্বেষিণী, তুমি বদলে গেলে, নিজ সুখ-সম্পদের দিকে চাইলে না, তুমি হ'লে সেবিকা, পৃথিবীর সব মা-হারা সন্তানদের তুমি বুকে টেনে নিলে ; তোমার দুঃখ-বেদনা যদি না জানতুম, তোমার কথা কি লিখতে পারতুম এমন ক'রে ?

পুত্র-মৃত্যুপীড়িতা মাতা কোনও উত্তর দিল না, দীপ্ত নয়ন যুগল অশ্রুতে অন্ধ হয়ে গেছে।

বিরহিণী অপরাজিতা বললে, অজিতকে ত মৃত্যুতে নিয়ে যায়নি, নিয়ে গেল এক ডাইনী, সে মায়াবিনীকে তুমিই ত আমাদের জীবনে আনলে, তোমার গল্প হয়ত বেশ জমল, কিন্তু আমার জীবন হ'ল ব্যর্থ, শূন্য। তুমি তোমার উপন্যাসের একটা

উপসংহার লেখ—অজিত বুঝতে পেরেছে ইন্দ্রাণী মেকী, তার ক্ষণিক রূপের মোহ ভেঙে গেছে, অজিত বুঝবে আমার প্রেম কত সত্য, আমি তার জন্য প্রতীক্ষা করছি, সে আমার কাছে ফিরে আসুক, তোমার উপন্যাসের কি সুন্দর শেষ হবে বল দেখি।

বললুম, আমার সমস্যা দেখছ না, অজিতকে তোমরা দু-জনেই ভালবাস, আমি কার সঙ্গে তার মিলন ঘটাই? অজিত যাকে ভালবাসবে, তার সঙ্গে মিলন হওয়া ভাল নয় কি? তোমার সঙ্গে যদি অজিতের বিবাহ দিতুম, আজ ইন্দ্রাণী এসে আমায় প্রশ্ন করত, আমাদের মিলন কেন হবে না, আমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসি? হয়ত তোমাদের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হয়ে যেত।

— মিথ্যা কথা, ইন্দ্রাণী কি অজিতকে আমার মত ভালবাসে! ও অজিতের টাকায় ভুলেছে।

—মানলুম, কিন্তু জীবনের বিপুল পথে মানব-দেহমনের লোভ মোহ ক্ষুধা বাসনা কামনাকে তুমি কোনও নিয়মে নিয়ন্ত্রিত করতে পার? আমি দিতে পারি অজিতকে তোমার হাতে, কিন্তু তুমি রাখতে পারবে কি? দীর্ঘ বিচিত্র জীবনপথে কত নবীনা ইন্দ্রাণী অজিতের হৃদয়-দ্বারে আঘাত করবে, অজিতের হৃদয় উদাস হবে, তার পায়ে শৃঙ্খল দিয়ে রাখতে পার, কিন্তু তার প্রেম পাবে কি? চাও তুমি তোমার ব্যর্থ প্রেমের কারাগারে তার অশান্ত বুভুক্ষু দেহমনকে বন্দী ক'রে রাখতে?

—কেন সে আমায় ভালবাসবে না? তুমি ত উপন্যাসে লিখতে পার, সে আমায় মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসল, তুমি ত তাকে তেমনই ক'রে সৃষ্টি করতে পার।

—অজিতকে আমি তোমার প্রেমিকরূপেই সৃষ্টি করতে চেয়েছিলুম, আমি লিখতে চেয়েছিলুম, সত্যিকার প্রেমিক আজীবন অনুরক্ত স্বামীর কথা, আঁকতে চেয়েছিলুম আদর্শ গার্হস্থ্য-জীবন। কিন্তু মানুষের মন ত আমার হাতের পুতুল নয়, সে সজীব, সক্রিয় অগ্নিগর্ভ, পর্ব্বতগুহাবতীর্ণা নদীধারার মত সে যে কোন্ পথে যাবে, পুরানো পাড় ভাঙবে, নূতন তীর গড়বে, তার পথের নির্দ্দেশ কে করতে পারে! সজীব মানুষ যখন আমার উপন্যাসে আসে, তাকে ত শৃঙ্খলিত সামাজিক অনুশাসনপীড়িত ক'রে আপন ইচ্ছা আদর্শ মত চালাতে পারি না, সব বাধা শৃঙ্খল ভেঙে সে তার নিজ যাত্রাপথ ক'রে চলে, আমি তার পথ চলার কাহিনী লিখি।

দোলানো-চেয়ার থেকে দীর্ঘ কৃষ্ণ অক্ষিপক্ষ্ম কাঁপিয়ে মাধবী আমার দিকে চাইল। বললুম, মূর্ত্তিমতী বেদনার মত তুমি মূক ব'সে আছ, মাধবী, তুমি ত কিছু বলছ না? আমার আত্মার সুগভীর বেদনা দিয়ে তোমায় সৃষ্টি করেছি, তুমি আমার প্রেমের কাহিনী জানো। শোন, তোমরা আমার গল্প শোন:

আমি যখন কিশোর ছিলুম, এক কিশোরীকে ভালবেসেছিলুম, সে ছিল আমার জীবন-রূপকথার রাজকন্যা, তাকে ঘিরে রচতুম যৌবনস্বপ্ন, জীবন-মায়াজাল। কিন্তু সে সুন্দরীর মন ছিল অন্যমনা, সে ভালবাসত আর-এক যুবককে, আনমনা হয়ে সে ব'সে থাকত আমার পাশে। জেদ হ'ল, জয় করব ওই কিশোরী-চিত্তকে। আমার প্রেমের সাধনায় সে মুগ্ধা হ'ল, তাকে জয় করলুম; যৌবনে

তাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে পেলুম। তারপর বাহির হলুম পৃথিবীর বিপণিতে, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার লুটে আনতে হবে প্রিয়ার পদপ্রান্তে; সেখানে স্বর্ণের জন্য হানাহানি, কাড়াকাড়ি, স্বার্থের সঙ্গে স্বার্থের সংঘাত, অর্থ-আহরণের প্রবল সংগ্রামে মেতে গেলুম। প্রথম যৌবনের প্রেম-বিহ্বল দিনগুলি স্বপ্ন হয়ে গেল; প্রিয়া যখন গান গায়, আমার এস্রাজ বাজাবার সময় হয় না; প্রিয়া যখন ছবি আঁকে, আমার রং গুলে দেবার অবসর কোথায়?

বাণিজ্য ক'রে আনলুম স্বর্ণ, ব্যাঙ্কে তহবিল উঠল উপছে। প্রিয়াকে সাজালুম,—কর্ণে মুক্তার দুল, কণ্ঠে হীরার মালা, অঙ্গুলিতে নীলার অঙ্গুরীয়, কটিতে স্বর্ণময় কাঞ্চী, পদে মণির নূপুর।

গঙ্গাতীরে তৈরি করলুম বিচিত্র প্রাসাদ প্রিয়ার জন্য। জার্ম্মান দেশ হ'তে এল স্থপতি, ইতালী হ'তে এল বিচিত্র বর্ণের মর্ম্মরপ্রস্তর, চৈনিক কারিগর তৈরি করল গবাক্ষ, পারসিক রীতিতে নির্ম্মিত হ'ল স্নানাগার।

প্রাসাদের চারিদিকে রমণীয় উদ্যান রচনা করলুম—পূর্ব্বদ্বারে অশোকবীথিকা, পশ্চিমে তালতমালশ্রেণী, উত্তরে পদ্মদীঘি, দক্ষিণে নীপবন, করবীকুঞ্জ।

কিন্তু প্রিয়ার মন রইল অন্যমনা, আনমনা হয়ে সে সুদূরে চেয়ে থাকে, প্রেমতৃষিতা।

সেদিন সন্ধ্যায় পশ্চিমাকাশের বর্ণোৎসবে পৃথিবী রঙীন, হেনা-হাস্নাহানাকুঞ্জের গন্ধোচ্ছ্বাসে বাতাস মাতাল, নদীর জল কূলে কূলে ভরা। বিপণি থেকে গৃহে ফিরলুম; চন্দনকাষ্ঠের দ্বার খুলে পারস্য কার্পেটমণ্ডিত অধিরোহণী অতিক্রম ক'রে প্রিয়ার কক্ষের

দিকে গেলুম। সে সন্ধ্যায় প্রিয়া পরেছিল মাধবী-রঙের শাড়ী, কণ্ঠে ছিল রজনীগন্ধার মালা; আমাকে দে'খে প্রিয়া স্মিতমুখে, চকিত-পদে এগিয়ে এল, শ্বেতপ্রস্তরের গৃহতল দর্পণের মত দীপ্তিময়, পদযুগল ফুটে উঠল রক্তকমলের মত, কিন্তু প্রিয়ার মন ছিল আনমনা, কাচের মত মসৃণ মেঝেতে পা গেল পিছলে, সে মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়ল, শুভ্র মর্ম্মরে রক্তপদ্মের পাঁপড়ি ছড়িয়ে লুটিয়ে পড়ল। সে মূর্চ্ছা ভাঙল না, অন্যমনা হয়ে আমার গৃহে চলতে চলতে প্রিয়ার চরণ স্খলিত হ'ল, মৃত্যু এল।

পশ্চিমাকাশের বর্ণোৎসব শেষ হয়ে অন্ধকার এল, আমার অগণিত অশ্রুবিন্দু অনন্ত আকাশ ভ'রে জ্বলে উঠল। সে-রাতে বিধাতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, তাকে যদি পেলুম, কেন তার ভালবাসা পেলুম না, তাকে এমন ক'রে কেন তুমি আমার কাছ থেকে নিয়ে গেলে? বোবা আকাশ কোনও উত্তর দিল না।

উন্মাদ হ'য়ে প্রাসাদ ভেঙ্গে দিলুম, প্রিয়ামৃত্যুবেদনা অহর্নিশি অন্তরে বহন ক'রে মহা উন্মাদনায় দেশ হ'তে দেশান্তরে ঘুরেছি। জীবনের সেই অপরিসীম বেদনাসমুদ্র মন্থন ক'রে তুমি এলে মাধবী, তুমি এলে তরুণ কবি রেবন্ত; তোমরা আনলে নবদৃষ্টি, নববাণী মানবজীবনে, সংসারের সুখদুঃখ পৃথিবীর সৌন্দর্য্য নূতন চোখে গভীর ভাবে দেখলুম। আগে যাদের হৃদয়ের ব্যথা বুঝিনি, যাদের তুচ্ছ অবহেলা করেছি, তাদের বীরত্ব, তাদের মহত্ত্ব দেখলুম, আত্মার নবজন্ম হ'ল। তুমি খুনী, তুমি ঘৃণিতা, তুমি পাগল, তুমি ক্লাউন, তোমাদের সঙ্গে অন্তরের পরিচয় হ'ল, তোমাদের সমব্যথী হলুম। তোমাদের দুঃখের কথা লিখেছি, তোমাদের আত্মার সংগ্রামবেদনার

কাহিনী। প্রিয়াবিরহকাতর আমার অন্তর দিয়ে যা অনুভব করেছি তাই লিখেছি, আমি কথাশিল্পী, তোমাদের দুঃখে সমবেদনায় কাঁদতে পারি, আমি দার্শনিক নই, মানবজীবনে দুঃখের অর্থ কেমন ক'রে বলব ? আমি শুধু বুঝেছি, অপরূপ এই পৃথিবী, মহান এই মানবজীবন।

আমি চুপ করলুম। ঘর-ভরা স্তব্ধতা কাঁপতে লাগল তেল-ফুরিয়ে-যাওয়া প্রদীপের শিখার মত। সহসা বিশেপাগল হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে ব'লে উঠল—আমি পারি, আমি পারি বলতে, এস আমার সঙ্গে।

বিশে-পাগল পূবদিকের সবুজ পর্দ্দা সরিয়ে আমার লাইব্রেরীতে যাবার দরজা খুলে দিলে। সবাই চমকে দাঁড়ালুম। লাইব্রেরীতে নটরাজ শিবের একটি মূর্ত্তি আছে দেখেছ, মূর্ত্তিটির দিকে বিশু ছুটে গেল, হাতজোড় ক'রে নতজানু হয়ে মূর্ত্তির সামনে বসল।

চোখে চমক লাগল। মনে হ'ল, এ আমার লাইব্রেরী নয়, ভারতীয় কোন গুহামন্দিরের গর্ভগৃহের সম্মুখে আমি দাঁড়িয়ে, গর্ভগৃহের অন্ধকারে অগ্নিকান্তি নটরাজ বিগ্রহ। গৃহের দ্বার শঙ্খ-পদ্মক্ষোদিত কারুকার্য্যময় প্রস্তর-নির্ম্মিত ; দ্বারের দক্ষিণে গঙ্গা ও বামে যমুনার লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি উৎকীর্ণ, অমৃতনিষ্যন্দিনী রূপ কঠিন প্রস্তর ভেদ ক'রে পদ্মের মত ফুটে উঠতে চায়—জ্যোৎস্নাশুভ্র গঙ্গা তরুচ্ছায়ায় মকরের ওপর বঙ্কিম ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে, এক হস্তে পূর্ণ জলকুম্ভ, অপর হস্তে প্রস্ফুটিত পদ্ম ; নীলোৎপলবর্ণা যমুনা কূর্ম্মের ওপর দাঁড়িয়ে, তাঁর এক হস্তে চামর, অপর হস্তে নীলোৎপল।

গর্ভগৃহে দশদিকে ষোড়শ হস্ত প্রসারিত ক'রে অপরূপ নটরাজ-

মূর্ত্তি—দক্ষিণ হস্তগুলিতে ডমরু বজ্র শূল পাশ টঙ্ক দণ্ড সর্প ও অভয়-মুদ্রা ; বাম হস্তগুলিতে অগ্নি খেটক ঘণ্টা কপাল খড়্গ পতাকা শুচিমুদ্রা ও গজহস্তভঙ্গী ; পিঙ্গল জটাভারে অর্ক ধুতুরা-পুষ্প, চন্দ্র, গঙ্গামূর্ত্তি ; কণ্ঠে মুক্তার হার, সর্প-হার, বকুলের মালা ; বামস্কন্ধে ব্যাঘ্র-চর্ম্ম ; কর্ণে কুণ্ডল ; হস্তে পদে মণিমাণিক্যবিজড়িত বলয় ; অগ্নিশিখা-বেষ্টিত পদ্মের ওপর দক্ষিণ পদ ; নৃত্যচঞ্চল বামপদ শূন্যে স্থাপিত।

বিশে-পাগল অট্টহাস্য করলে—হাঃ হাঃ! পদ্ম-পীঠ ঘিরে অগ্নিশিখা নেচে উঠল। চারিদিক অন্ধকার হয়ে এল। নটরাজ নৃত্য সুরু করলেন। নৃত্যের তালে তালে হস্তের নানা অস্ত্র দিকে দিকে ছুঁড়ে ফে'লে দিতে লাগলেন। পরম বিস্ময়ে দেখলুম, নানা অস্ত্রের বদলে আমার গল্প-উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা তাঁর অগণিত হস্তে পুত্তলিকার মত শোভিত। নটরাজ তাঁর ডমরু ছুঁড়ে ফে'লে দিলেন আমার দিকে, যেন তিনি বললেন, আমার ডমরু তুমি বাজাও, আমি তোমার সৃষ্ট নরনারীদের নিয়ে নৃত্যে মাতি। দেখলুম, পুত্রশোকাতুরা মাতা, চিরবিরহিণী প্রেমিকা, জীবনের হলাহলপায়ী পাগল, সবাই মেতেছে তাঁর হস্তে জন্মমৃত্যু সুখদুঃখের নৃত্যের উন্মাদনায়।

আকাশের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত বিসর্পিল গতিতে বিদ্যুৎ চমকে গেল। অশনি-গর্জ্জনে চমকে জেগে দেখি, সিঁড়ির পাশে বারান্দায় বেতের লম্বা চেয়ারে শুয়ে আছি, আমার চোখেমুখে বৃষ্টির জল অঝোরে ঝ'রে পড়ছে, বাতাসে অন্ধকার আকাশ হা হা ক'রে উঠল।